দাম : সাত টাকা
স্বস্তিকা
৬৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ১৮ জুন - ২০১২।। ৩ আষাঢ় - ১৪১৯।।
শরীরং রথমেব তু

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

তৃণমূলের মতো অবিশ্বস্ত শরিকের বদলে বামেদের উপরই ভরসা রাখবে কংগ্রেস ▯ ৯

হলদিয়ায় পরাজয়ে শুভেন্দুর লোকসভায় প্রার্থী হওয়া প্রশ্নের মুখোমুখি ▯ ১০

খোলা চিঠি : শাহরুখের 'ডন-টু' হিট করেনি, হলদিয়ায় 'লক্ষণ-টু'ও ফ্লপ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

শিখণ্ডী পরিসংখ্যান : কংগ্রেসী সংস্কারেই গভীর আর্থিক সঙ্কটে দেশ ▯ এন সি দে ▯ ১২

শরীরং রথমেব তু ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ১৪

'শ্রীরামকৃষ্ণ কেল্লা'য় রথোৎসব ▯ অর্ণব নাগ ▯ ১৬

পুরীর রথের টুকিটাকি ▯ ১৮

সূর্যপুত্র মহাবীর কর্ণ ▯ প্রিয়াংশু বিকাশ ভট্টাচার্য ▯ ২১

অধ্যাত্ম রামায়ণ মন্দির ▯ ২২

রামজীবনপুরের মন্দির ▯ ডঃ প্রণব রায় ▯ ২৩

শতবর্ষে অনালোচিত বেগম সুফিয়া কামাল ▯ মিতা রায় ▯ ২৬

নমাজে হুঙ্কার : মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ার ▯ শিবাজী গুপ্ত ▯ ২৭

মার্ক্সবাদীদের বর্বরোচিত অসহিষ্ণুতা ▯ বলবীর কে পুঞ্জ ▯ ২৮

মণিপুরী জঙ্গি ও মাওবাদী বোঝাপড়া ▯ ৩০

'গ্রামের লোকেরাই ফাঁসিয়েছে'— মুসলিম মেয়ের স্বীকারোক্তিতে বেকসুর খালাস হিন্দু যুবক ▯ ৩২

জাড়া জমিদারবাড়িতে কবিগান প্রসঙ্গে : ▯ দীনেশচন্দ্র সিংহ ▯ ৩৬

৯৩ বছরের জীবন্ত কিংবদন্তী মান্না দে ▯ বিকাশ ভট্টাচার্য ▯ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ ▯ ভাবনা-চিন্তা : ২০ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫ ▯ ▯ সু-স্বাস্থ্য : ৩৮ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

প্রচ্ছদের ছবিটি এঁকেছেন রমাপ্রসাদ দত্ত।

৬৪ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ৩ আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৮ জুন - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

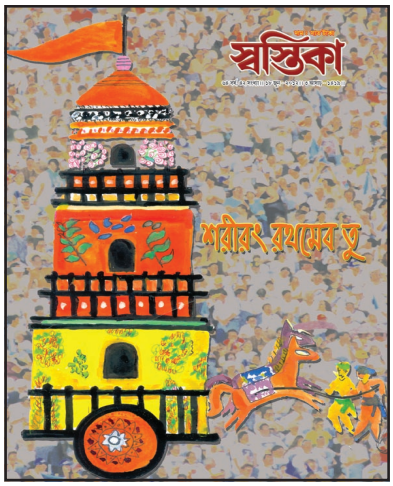

শরীরং রথমেব তুঃ
পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা

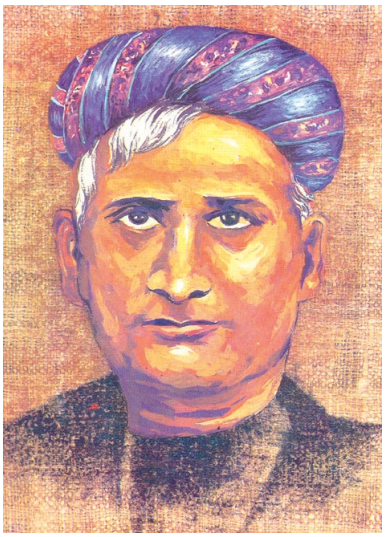

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পুনরুত্থানের অন্যতম পুরোধাপুরুষ। একই সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক। বঙ্গসাহিত্য স্রোতধারার তিনি ভগীরথ। আবার শাসনের কঠিন কঠোর বাতাসে বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণের ধূম ও ভস্মরাশিও নিবারিত করেছেন। তখন তিনি কঠোর সমালোচক, সম্পাদক। তাঁর একশ পঁচাত্তর বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধার্ঘ্য— **বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা**। লিখছেন : ডঃ অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ২ জুলাই, ২০১২

যে কাশ্মীরকে ভারতে পূর্ণ বিলয়ের দাবিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আত্মবলিদান করেছিলেন, স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে আমাদের জাতীয় নেতাদের দূরদর্শিতার অভাব ও ঔদাসীন্যই কাশ্মীর এখনও আমাদের গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অবদানকেও। এসবেরই পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন তথাগত রায়, ও পি গুপ্ত, কে কে গাঙ্গুলী প্রমুখ।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে থাকছে নানা তথ্য। সব মিলিয়ে এক সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা।

২২ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চোরের মায়ের বড় গলা

প্রধানমন্ত্রীসহ পনের জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলিয়াছেন আন্না হাজারে। বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করিয়া এই মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানাইয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠিও পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার সহযোগীরা। প্রত্যাশিত ভাবেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি খারিজ করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সরকারের কড়া বার্তা শোনা গিয়াছে। যাহারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত তাহাদের কাছেই তদন্তের দাবি জানাইলে তাহা খারিজ হইবে এবং চোরকে চোর বলিলে চিরকালই চোর তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তাহাই করিয়াছে। প্রতি-আক্রমণই আত্মরক্ষার সেরা উপায়— এই কৌশল অবলম্বন করিয়া বরং আন্না হাজারের টিমকেই দুর্নীতির আখড়া বলা হইয়াছে। দুর্নীতির অভিযোগের লক্ষ্য এক্ষেত্রে কিরণ বেদীর দিকেই বেশি। যে মহিলা পুলিশ অফিসার হিসেবে সারাজীবন দুর্নীতির বিরুদ্ধেই লড়াই করিয়া আসিয়াছেন এবং শীলা দীক্ষিত, মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধীরা নিজেদের সততার মুখোশ খুলিয়া যাইবার ভয়ে অনৈতিক ভাবে যাঁহার পদোন্নতি ঘটিতে দেন নাই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাবা রামদেব দুর্নীতির অভিযোগ তুলিতেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের বন্যা বহিতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে। আগামীদিনে যাহারাই অভিযোগ করিবে তাহাদের বিরুদ্ধেই এইভাবে আক্রমণ করা হইবে। দুর্নীতিগ্রস্তদের সাম্রাজ্যে আঘাত করিলে এইভাবেই তাহারা প্রতি-আক্রমণ করিয়া থাকে। প্রবাদ রহিয়াছে— 'চোরের মায়ের বড় গলা'। প্রবাদ জনজীবনের দর্পণ। জনসমাজের অভিজ্ঞতাই তাহাতে প্রতিফলিত। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীরা আর কতকাল তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের দেশদ্রোহী বলিবেন আর নিজেরা দেশপ্রেমিক সাজিয়া জনগণের অর্থ লুঠ করিবেন। কয়লা-ব্লক দুর্নীতি লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিবার পরেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিভাবে সৎ থাকেন? প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না মানিলেও তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কয়লা সচিব পি সি পারেখ একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে জানাইয়াছেন— এই অভিযোগ তিনি উড়াইয়া দিতেছেন না। আসলে কিরণ বেদী ঠিকই বলিয়াছেন, এই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সততা লইয়া কোনও প্রশ্ন উঠিতেছে না ঠিক কথা। কিন্তু যেভাবে পরের পর দুর্নীতির অভিযোগ তাঁহার সরকারের বিরুদ্ধে উঠিতেছে তাহাতে প্রধানমন্ত্রীর গায়ে কালি লাগিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও ইহাই ভবিতব্য। একইভাবে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়া কৌরবেরা তাহাদের যাবতীয় অন্যায় অনৈতিক কার্যকলাপ চরিতার্থ করিত। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহার পুত্রদের প্রতি পিতার দায়বদ্ধতার কারণে পুত্রদের যাবতীয় দুষ্কর্মের প্রতিকার প্রতিবাদ তো দূরস্থান বরং সেই অন্যায়গুলি সমর্থন করিয়া তাহাদের পুনঃ পুনঃ দুষ্কর্মের প্রতি আগ্রহী করিয়া তুলিতেন। এই অনাচারী দুরাচারী পুত্রগণের পরিণতি মহাভারতে বর্ণিত রহিয়াছে। একারণে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ রাজবংশও ধ্বংস হইয়াছিল। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার পারিষদেরা কি ইতিহাস হইতে কোনও ভাবেই শিক্ষা গ্রহণ না করিবার শপথ লইয়াছেন?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

সাংসারিক ব্যক্তি জীবন ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখাও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ তাহাতে অকৃতকার্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না। তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এই : আমাদিগকে মরিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই; তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কাজ— আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি— সব যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখী করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ, কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বিধান করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি অপরের কল্যাণের জন্য, জীবন উৎসর্গ করিতে না পারো?

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সর্ষের মধ্যেই ভূত

গ্রেপ্তার চার বরিষ্ঠ আয়কর কর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি জুন মাসের ৪ তারিখে সিবিআই উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীর বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে আয়কর দপ্তরের চার বরিষ্ঠ কর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এই চার কর্তারা হলেন ডাইরেক্টর (ইনভেস্টিগেশন) কুনাল সিং, অতিরিক্ত ডাইরেক্টর (ইনভেস্টিগেশন) রতন সিং ও অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিক। সি বি আই তার হানা চলাকালীন অভিযুক্ত সংস্থা এলডেকোর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অঙ্গজ বাজাজকেও গ্রেপ্তার করেছে।

সংবাদে প্রকাশ, গ্রেপ্তার হওয়া কুনাল সিং আয়কর বিভাগের কানপুর অঞ্চলের এক অতি উচ্চপদস্থ ও বর্ণময় আই আর এস আধিকারিক। ঘটনার সময় তিনি কানপুর রেঞ্জেওর অস্থায়ী আয়কর কমিশনারের পদে ছিলেন। সূত্র অনুযায়ী শ্রী সিং সম্প্রতি গ্রেটার নয়ডা অথরিটি সহ অন্যান্য একাধিক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির দপ্তরগুলিতে তল্লাসি চালাছিলেন। ধরা পড়ার সময় কুনাল সিং-এর হেফাজত থেকে ৩০ লক্ষ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্তকারী সংস্থা সহকারী কমিশনার উমাকান্ত, ইন্সপেক্টর হরিশ টোন্ডিয়াল ও অনিল জয়সোয়াল নামে এক চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকেও গ্রেপ্তার করেছে।

এলডেকোর অফিস (ডানদিকে), বাঁদিকে অঙ্গজ বাজাজ।

রাজধানীতে চাঞ্চল্য ফেলে দেওয়া এই খবরের সংবাদসূত্র অনুযায়ী জানা যায়, কিছুদিন ধরেই গোপন সূত্রে সি বি আই জানতে পারে অভিযুক্ত আয়কর আধিকারিকরা 'এলডেকো' নামের সংস্থাটির সঙ্গে এক অবৈধ চুক্তিতে জড়িয়ে পড়েছে। কর ফাঁকিসহ তাদের নানান অবৈধ কাজে মদত দিয়ে আসছে। গত মার্চ মাসে সি বি আই-এর তরফে চালানো এক সমীক্ষায় অভিযুক্ত সংস্থাটির কর ফাঁকির বিষয়টি গোচরে আসে। এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই তদন্তকারী সংস্থা দিল্লী, গাজিয়াবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও নয়ডায় একযোগে অভিযান চালায়।

তদন্তে উঠে আসা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য অনুযায়ী আয়কর দপ্তরের গ্রেপ্তার হওয়া আধিকারিকরা অভিযুক্ত সংস্থার মালিকদের ব্যাঙ্ক লকার বাজেয়াপ্ত করার সময় ঘুষ-এর বিনিময়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের মূল্যবান গয়নাগাঁটি ও নগদ টাকা পাচার করে দিতে সব রকম সাহায্য করেছিলেন। তদন্তে এলডেকো কোম্পানীর কর্তা পঙ্কজ বাজাজ স্বীকার করেছেন উদ্ধার হওয়া ৩০ লক্ষ টাকা আয়কর কমিশনার কুনাল সিংকে তিনি নিজেই তাঁর কোম্পানীর বিরুদ্ধে কর ফাঁকির মামলাটি গুটিয়ে নেওয়ার জন্য ঘুষ হিসেবে দিয়েছেন। সংবাদে আরও প্রকাশ, সি বি আই-এর দল কোম্পানীর কর্তার গ্রেটার কৈলাসের বসতবাড়ি, অভিযুক্ত আয়কর আধিকারিক উমাকান্ত ও রতন সিং-এর গাজিয়াবাদের বাড়িতেও তল্লাশি চালায়। একইভাবে জয়সোয়াল-এর কানপুরে ও ধুন্দিয়ালে বিনোদ নগরের বাড়িতেও অভিযান চলে। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী এই নজিরবিহীন তল্লাশির ফলে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা, অলঙ্কার ও বহ বেআইনী কাগজপত্র। অভিযুক্তদের পাতিয়ালা হাউস কোর্টে তোলা হলে তাদের ৭ দিন পুলিশ হেফাজতে চালান দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরষের মধ্যে এমন ভূত শোনা গেলেও সচরাচর নজরে পড়ে না।

'ভারতমাতা কী জয়' গানটি কুরুচিকর ভাবে দেখানোর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুক্তি প্রতীক্ষিত হিন্দি চলচ্চিত্র 'সাংহাই' ছবিতে 'ভারতমাতা কী জয়' গানটি কুরুচিকরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। এই মর্মে দিল্লী উচ্চ আদালতে অভিযোগ দায়ের করলেন ভগৎ সিং ক্রান্তি সেনার পক্ষে সংস্থার কর্ণধার তেজিন্দর সিং পাল বাগ্গা। সংবাদসূত্র অনুযায়ী যেভাবে ভারতমাতা গানটি ছবিতে প্রযুক্ত হয়েছে তা দেশের পক্ষে সম্মানহানিকর। গানটির বাক্যাংশে যে রুচিহীন, অমর্যাদাকর শব্দাবলী প্রয়োগ করা হয়েছে তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক গীতিকারের জাতি হিসেবে ভারতের ওপর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে ভারতমাতার প্রতিরূপ কল্পনা করে মৃত্যুপণকারী স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা যে প্রেরণা সংগ্রহ করত সেই অনুপ্রেরণা স্থলের মূলে আঘাত করেছে বিকৃতরুচির গানটি।

সংবাদ সূত্রে আরও প্রকাশ, চলতি সপ্তাহেই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন ও সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ছবির গানটি শুধু নয়, এর অডিও সি ডি বিক্রির ওপরও অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা জারির করার ব্যাপারে আর্জি জানাবে সংস্থা। প্রয়োজনে আদালতেও যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সাংহাই' একটি রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক পটভূমি আশ্রিত চলচ্চিত্র।

হিন্দুদের করের টাকায় নয়, নেতা-মন্ত্রীরা নিজের টাকায় মুসলিম তোষণ করুন—ডাঃ তোগাড়িয়া

ফরাক্কা থেকে ফিরে বাসুদেব পাল॥ হিন্দুদের করের টাকায় মমতা সরকারের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। তিনি গত ১০ জুন ফরাক্কার নেতাজী ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তব্য প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কোনও রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী যদি তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে এরকমভাবে মুসলমান তোষণ করেন তাহলে তাঁর কোনও আপত্তি থাকবে না। সরকার উৎপাদন শুল্ক নেয় বলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। সাধারণ ক্রেতারা তা বুঝতে পারেন না।

ডাঃ তোগাড়িয়া মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি অর্থে ল্যাপটপ দেওয়ারও তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, মুসলমান থোক ভোট (Muslim Block Vote) পেতে ভিখারী রাজনৈতিক নেতারা এই চূড়ান্ত তোষণ করছেন।

শত শত বৎসর ধরে মুসলমান ও খৃস্টান শাসকরা ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করেছে। ৫০০ বছর ভারত শাসন করার পরও মুসলমানরা কী করে গরীব থাকে— ডাঃ তোগাড়িয়া এই প্রশ্ন সবার সামনে তুলে ধরেন। ২০০ বছর 'খৃস্টান' ইংরেজরা এদেশ শাসন, শোষণ করেছে। মুসলমানরা গরীব হলে ঈদের দিন ৯০,০০০ ছাগল কাটে কীভাবে?

রাজিন্দার সাচার ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ মেনে মুসলমান ও খৃস্টানদের এস সি, এস টি এবং ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। অথচ ভারতের সংবিধানসভার মতে কেবলমাত্র হিন্দুরাই এস সি, এস টি এবং ওবিসিও— অন্যরা তা হতে পারে না। অতিরিক্ত জন্মহারের কারণে যদি মুসলমানরা গরীব হয় তাহলে তার দায় হিন্দুরা কেন নেবে?

এদেশের প্রায় ১ কোটির বেশি মুসলমানকে কেন্দ্র সরকার ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা মাসিক বৃত্তি এবং ব্যবসার জন্য ঋণ হিসেবে

ফরাক্কায় জনসভায় ভাষণরত প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। মঞ্চে স্বামী গুরুপদানন্দজী (বাঁদিকে) এবং অন্যরা।

দিয়েছেন। এটা সরকারি হিসাব।

সর্বত্র মুসলিম পুলিশ অফিসার রাখা বাধ্যতামূলক করার সরকারি সিদ্ধান্তকেও ডাঃ তোগাড়িয়া তীব্র সমালোচনা করেন। পুলিশে এভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ভালো হবে না বলে তিনি সাবধান করে দেন।

কলকাতায় মুসলমান দুষ্কৃতীদের হাতে হিন্দু মহিলা ধর্ষণের জন্য তিনি মমতা ব্যানার্জির সরকারকে তুলোধুনা করে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও মুসলমান মহিলার ক্ষেত্রে এরকম ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী কী করতেন? সীমাহীন মুসলমান তোষণের মোকাবিলার জন্য তিনি হিন্দুদের জন্য পাঁচ সূত্রীয় যোজনা সবার সামনে রাখেন—

(১) আমরা হিন্দুরা সকলে এবং সাধ্যমতো কমপক্ষে একজন হিন্দুকে সাহায্য করব। (২) হিন্দু হওয়ার জন্য গর্ববোধ, ভাষা, বেশ-ভূষায়ও হিন্দুত্ব। পৃথিবীর কোথাও একজন হিন্দু অপমানিত হলে তার জন্য প্রতিবাদ জানাতে হবে নিজের এলাকাতে। (৩) হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা এবং হিন্দু হিতরক্ষাকারীকেই ভোট দেওয়া। (৪) ভারত হিন্দুরাষ্ট্র— হিন্দু রাজ্য বানাতে হবে। এজন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। (৫) মুসলমান ভোটের গোলাম নেতাদের বহিষ্কার।

হিন্দুরা এদেশে ৯০ কোটি। প্রতিদিন পাঁচ কোটি হিন্দু একত্রিত হয়ে শপথ উচ্চারণ করলে ঢাকাতেও গৈরিক পতাকা উড়বে বলে তোগাড়িয়া মন্তব্য করেন।

বস্তুতপক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির উপলক্ষে ডাঃ তোগাড়িয়া ফরাক্কায় এসেছিলেন। চল্লিশ জন মহিলা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১৬২ জন দশদিনের আবাসিক শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। ১০ জুন সন্ধ্যায় শিবির সমাপ্ত হয়।

জনসভার অন্যতম বক্তা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দিরের প্রধান স্বামী গুরুপদানন্দ, লাভ-জেহাদের মাধ্যমে হিন্দু মেয়েদের মুসলমান হওয়া সম্পর্কে মা-বোনেদের সাবধান করে দেন। মুসলিম বলাৎকারীদের আঁশবঁটি দিয়ে মোকাবিলার জন্য তিনি মা-বোনেদের উপদেশ দেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায় এবং মালদা থেকে আগত সঞ্জীব মিশ্র প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ডাঃ চিন্ময় দত্ত এবং শেষে ধন্যবাদ জানান প্রশিক্ষণ বর্গের প্রমুখ নকুলচন্দ্র ঝা।

গণরোষে মৃত্যু দুই মুসলিম দুষ্কৃতীর

প্রতিশোধ নিতে তাণ্ডব জালাবেড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২ জুন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলি থানার জালাবেড়িয়া গ্রামে স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতে ২ মুসলিম দুষ্কৃতী ধরা পড়ার পরে গণপ্রহারে তাদের মৃত্যু হয়। এলাকার একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার পথে ওই দুষ্কৃতীরা স্থানীয় গ্রামবাসীর হাত থেকে ভাল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে পালাবার সময়ে ধরা পড়ে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ— এই মুসলিম দুষ্কৃতীরা গত কয়েক বছর ধরেই এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম যেমন চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, লুট, খুন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকায় মানুষ তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। পুলিশ-প্রশাসন ছিল নির্বিকার। ফলে ধরা পড়ার পরে স্বাভাবিকভাবেই গণরোষে তাদের মৃত্যু হয়।

যেহেতু নিহত দুষ্কৃতীরা মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং তাদের মৃত্যু হয়েছে হিন্দু এলাকায়, সেকারণে ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার চেষ্টা করে স্থানীয় কিছু মুসলিম রাজনৈতিক নেতা ও মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। তারা এলাকার হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য কুলতলি থানার পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে গত ৪ জুন জালাবেড়িয়া গ্রাম থেকে নিমাই শিকারি (পিতা-পঞ্চু শিকারি) এবং রোহিত নস্কর (পিতা বিষ্ণু নস্কর) নামে দু'জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। এই দুই নিরীহ, গরীব গ্রামবাসীর সঙ্গে ওপরের ঘটনার বিন্দুমাত্র যোগ নেই বলে গ্রামবাসীদের দাবি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি তারা পুলিশ কাস্টডিতে এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হওয়ায় নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে তাদের পরিবারবর্গ।

পুলিশ ও মুসলমানদের এই ষড়যন্ত্র এলাকাবাসী হিন্দুদের গোচরে এলে তার পরদিন অর্থাৎ ৫ জুন থেকে স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা ও দুই নিরপরাধ হিন্দু যুবককে ছেড়ে দেবার দাবিতে বনধ্‌ও ডাকা হয়। আন্দোলনের চাপে পড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দাবিতে গত ৬ জুন জামতলা বিডিও অফিসে সর্বদলীয় সভার আয়োজন করে স্থানীয় প্রশাসন। আর এস এস, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বিজেপি-র প্রতিনিধিরাও এই বৈঠকে যোগদান করেন। প্রত্যেকটি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানরা তাঁদের নিজের নিজের গ্রামে এধরনের বৈঠক করবেন বলে সেখানে সিদ্ধান্ত হয়। শান্তি বজায় রাখতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করতে স্থানীয় প্রশাসনের এই উদ্যোগ লোক দেখানো কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ এই উদ্যোগ সত্ত্বেও মুসলিম নেতৃত্ব হিন্দুদের জীবন নাশের হুমকি দিয়ে চলছে। এমনকী বাইরে থেকেও মুসলমানদের এনে প্রতিদিন রাতে অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা-বারুদ নিয়ে হিন্দুদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগও আসছে। হিন্দু গ্রামবাসীদের বাড়িঘর ধ্বংস ও লুট-পাঠ, হিন্দু মেয়ে ও গৃহবধূদের অপহরণ, হিন্দুদের সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেবার বহু অভিযোগের পরও প্রশাসন নির্বিকার।

শুধু তাই নয়, হিন্দুদের অভিযোগও নিচ্ছে না পুলিশ। ক্ষতিগ্রস্তদের একটা অভিযোগও তাই এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়নি। থানা এখন স্থানীয় হিন্দুদের কাছে বিভীষিকার মতোই ঠেকছে। সেকারণে অধিকাংশ হিন্দু গ্রামবাসীই প্রাণের ভয় করছেন ও নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন।

আসমা জাহাঙ্গীরকে মারতে চাইছে আই এস আই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানের সরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে বলে প্রকাশ্যে অভিযোগ জানালেন পাকিস্তানের স্বনামধন্যা মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীর। সম্প্রতি লাহোরে তিনি এই অভিযোগ করেন। তাঁর এই বক্তব্যের পর পাকিস্তানে যে ক'জন নিরপেক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ

আসমা জাহাঙ্গীর

আছেন তাঁরা সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রতিষ্ঠিত উকিল এবং গণতন্ত্রের সমর্থক জাহাঙ্গীর গত ৪ জুন রাত্রিতে এক টিভি চ্যানেলে তাঁর জীবনহানির আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। উনি বলেছেন, "বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, সরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলো আমার উপরে প্রাণঘাতী হামলা করার পরিকল্পনা করছে।"

এরপরই শ্রীমতী জাহাঙ্গীর তাঁর ঘোরাফেরা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। একরকম গৃহবন্দী হয়ে আছেন— বাইরে খুব একটা বেরোচ্ছেন না। তিনি আরও জানিয়েছেন, সরকারের অনেক উপরের স্তরে ওই 'প্রাণঘাতী পরিকল্পনা' তৈরি হচ্ছে। এই চক্রান্তকারীরা বালুচিস্তানে মানবাধিকার হননের খবর প্রকাশ্যে আসাতে চরম অসন্তুষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানের দুটি গোয়েন্দা সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে ওই পরিকল্পনায় যুক্ত। তিনি একটি ঘটনার কথা বলেছেন, — সম্প্রতি উকিলদের একটি গোষ্ঠী এক সভার জন্য স্থান সংরক্ষণ (বুক) করে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে, আসমা জাহাঙ্গীর সেখানে অন্যতম বক্তা, তখনই ওই বুকিং বাতিল করে দেওয়া হয়। পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-ই তাঁর পিছনে লেগেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন বলেছে, জাহাঙ্গীরের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। এক বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, শ্রীমতী জাহাঙ্গীরের জীবনের প্রতি যে কোনওরকম বিপদকেই যেন খাটো করে না দেখা হয়।

তৃণমূলের মতো অবিশ্বস্ত শরিকের বদলে বামেদের উপরই ভরসা রাখবে কংগ্রেস

গূঢ়পুরুষের

কলম

প্রসঙ্গ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। হঠাৎ কোনও অঘটন না ঘটলে আগামী ১৫ জুন কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতিপদে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হলে ক্ষমতাসীন ইউপিএ-র প্রধান শরিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতা করবে। কারণ, তৃণমূল নেত্রী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, প্রণববাবুর চক্রান্তেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক প্যাকেজ কেন্দ্র দিতে নারাজ। তৃণমূল নেত্রী একথাও বিশ্বাস করেন, প্রণববাবুর পরোক্ষ মদতেই প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা পদে পদে জোট সঙ্গীর বিরোধিতা করছে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্তরঙ্গ মহলে একাধিকবার বলেছেন, দিল্লীর যে খুঁটির জোরে রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লম্বা চওড়া কথা বলছেন সেই খুঁটি তিনি উপড়ে ফেলবেন। মমতা রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে খতম করতে চান। সিপিএমকে ততটা নয়। মমতার নিজের কথায়, বাইরের চেনা শত্রুদের থেকে ঘরভেদী শত্রুরা ভয়ঙ্কর। তিক্ততা এখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অদূর ভবিষ্যতে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে একটা বহুল প্রচলিত কথা আছে, রাজনীতিতে কেউই পাকাপাকিভাবে বন্ধু বা শত্রু থাকে না।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতিতে বন্ধু এবং শত্রু চিহ্নিত হয়। যেমন, লালুপ্রসাদ যাদব ও মুলায়ম সিংহ যাদবরা একদা কংগ্রেসের ঘোর শত্রু ছিলেন। এখন পরম বন্ধু।

তবে ভারতের এক নম্বর রাজনৈতিক সুবিধাবাদী দল হচ্ছে সিপিএম এবং তার লেজুড় অন্যান্য বামপন্থী দলেরা। বামপন্থীরা ক্ষমতার রাজনীতিতে উঠে এসেছে কংগ্রেসকে দেশের শত্রুদল চিহ্নিত করে ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মুখে বড় বড় বিপ্লবী বুলি আওড়ালেও আদতে কংগ্রেস বিরোধিতাকে মূলধন করেই বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করেছিল। সেই কংগ্রেস এখন সিপিএমের পরম বন্ধু। তাই তারা জানিয়ে দিয়েছে যে প্রণববাবুকে রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী করলে বামেরা পূর্ণ সমর্থন জানাবে। দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, বামেদের সমর্থন পেলে কংগ্রেসের পক্ষে প্রণববাবুকে জিতিয়ে আনতে তৃণমূলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। কারণ, বামেদের মিলিত ভোট তৃণমূলের চেয়ে বেশি। শুধু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনই নয়, জাতীয় রাজনীতিতে আগামী দিনে সিপিএমসহ সমস্ত বামপন্থীরাই কংগ্রেস এবং তার ইউপিএ-র প্রতি সমর্থন করবে। বাম নেতৃত্ব বিশ্বাস করে যে আগামী দিনে তৃণমূল নেত্রী ইউপিএ জোট ছাড়তে বাধ্য হবেন। এর আগে ২০০৯ সালে ইউপিএ সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে বামপন্থীরা নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছিল। সিপিএম দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেস গোঁসা করে ইউপিএ জোট থেকে বেরিয়ে গেলে বামেরা বাইরে থেকে সমর্থন করে মনমোহন সিং সরকারকে অক্সিজেন সরবরাহ করবে। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃণমূলের মতো অবিশ্বস্ত শরিকের বদলে বামেদের উপরই ভরসা রাখবে। তাছাড়া সংখ্যার নিরিখে সংসদে বামরা এগিয়ে। জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট হয়ে যাবে বামপন্থীদের রাজনৈতিক লাইনটি। যেমন, প্রথম ইউপিএ জোট সরকার টিকে ছিল বামপন্থীদের সমর্থনে। এখন তৃণমূল সমর্থন প্রত্যাহার করলে বামেরা আগ্ বাড়িয়ে দ্বিতীয় ইউপিএ জোট সরকারকে টিকিয়ে রাখবে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে। কারণ, জাতীয় রাজনীতিতে বামেরা এখন প্রভাবহীন শূন্য কলসি। তাছাড়া বাম নেতৃত্ব বিশেষত সিপিএম নেতৃত্ব মনে করছে আগামী লোকসভার নির্বাচনের পর সম্ভবত দুই প্রধান জোটের কেউই পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সেক্ষেত্রে ত্রিশঙ্কু লোকসভায় সরকার কে গড়বে তাই নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রণববাবু বরাবরই বামপন্থীদের পছন্দের নেতা। প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি হলে ক্ষমতার কেন্দ্রে বামেদের ছড়ি ঘোরাতে সুবিধা হবে। তাই রাষ্ট্রপতি পদে প্রণব মুখোপাধ্যায়কেই সমর্থন করবে সিপিএমসহ বামেরা।

এদিকে ইউ পি এ-র বিভিন্ন শরিকদলের সঙ্গে আলোচনা করে কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, রাষ্ট্রপতি পদে প্রণববাবুকে প্রার্থী করলে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ইউপিএ-র আর সব শরিকই তাঁকে সমর্থন করবে। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল সমর্থন না করলেও ক্ষতি নেই। বরং কংগ্রেস মনে করছে সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হবে। ইতিমধ্যেই ইউপিএ জোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে শরিকদের অসন্তোষ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। শরিকরা মনে করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্ল্যাকমেল করে বাড়তি গুরুত্ব নিতে চাইছে। শারদ পাওয়ারের এন সি পি, এম করুণানিধির ডি এম কে এবং অজিত সিং-এর আর এল ডি স্পষ্টভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রপতি পদে দেখতে চান। অন্যদিকে মুলায়ম সিংহের সমাজবাদী পার্টি এবং লালুপ্রসাদ যাদবের আর জে ডি প্রণববাবুকেই ভোট দেবে বলে জানিয়েছে। এমনকি এনডিএ জোটের শরিক সংযুক্ত জনতা দলের নেতা শরদ যাদব বলেছেন, প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হলে তাঁর দলের সমর্থন থাকবে। এখন দেখার কীর্নাহারের বাঙালি ব্রাহ্মণের ঠিকানা রাষ্ট্রপতি ভবনে হয় কিনা। এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে প্রণববাবুর ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তবে শেষ কথা বলবেন সোনিয়া গান্ধী। তিনিই দলের প্রার্থী স্থির করবেন। দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের চরম মুহূর্তে তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে ছাড়বেন কিনা সে সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হবে।

হলদিয়ায় পরাজয়ে শুভেন্দুর লোকসভায় প্রার্থী হওয়া প্রশ্নের মুখোমুখি

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

রাজ্যে ৬টি পুরসভার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ৪টি পুরসভা তৃণমূল অধিকার করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধূপগুড়ি ও দুর্গাপুর। এই দুই পুরসভা থেকে সিপিএম-কে অপসারিত করে তৃণমূল দখল করেছে।

সিপিএম বহু কষ্টে হলদিয়াতে ১৫টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। তৃণমূল এখানে ১১টি ওয়ার্ডে জিতেছে। হলদিয়াতে এবার ১০টি আসনে সিপিএম জয়ী প্রার্থীর নিকটতম স্থানে আছে। ২০০৭ সালে হলদিয়াতে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ঠিক এর উল্টো ফল হয়েছিল। অর্থাৎ তৃণমূল হলদিয়া পুরসভার ১৫টি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল। আর সিপিএম ১১টি-তে এগিয়ে ছিল। এখানে কি শুভেন্দু অধিকারীকে 'কাট টু সাইজ' করার জন্য তৃণমূলের অপর গোষ্ঠী উল্টে দিয়েছে ফলাফল? তৃণমূলের সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই সবই নাকি নেত্রী জানতেন। তাঁর নির্দেশেই নাকি অধিকারীদের রাজত্ব ভাঙার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীকে নেত্রীর করতলগত হতেই হবে। ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে শুভেন্দু-এর মনোনয়ন পাওয়া বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন।

শুধু শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন নয়, ভবিষ্যতে মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে বাতিলের লিস্টে থাকতে পারেন কবীর সুমন, দীনেশ ত্রিবেদী, সুচারু হালদার, সোমেন মিত্র, সৌগত রায় প্রমুখেরাও। এঁদের মনোনয়ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

দুর্গাপুরে সিপিএম কোনওদিনই পরাজিত হয়নি। অথচ এবারে সিপিএম মাত্র ১০টি আসনে জিতেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্গাপুর পুরসভা দখল করেছে। উল্লেখ্য, আর এস পি ১টি ও বিজেপি ১টি-তে জিতেছে। নির্দল প্রার্থী অরবিন্দ নন্দী জয়ী হয়েছেন। ২০০৭ সালে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ৩৫ টি আসনে জিতেছিল। এবারে ৩১টি আসনে সিপিএম জয়ীর নিকটতম স্থানে।

ধূপগুড়ি থেকে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ধুয়ে গেছে। পুরসভার এই ফলাফল প্রমাণ করে যে গ্রাম-সংলগ্ন পুরসভায় তৃণমূলের প্রভাব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। তবে কথা উঠেছে যে ধূপগুড়িতে সিপিএমের মধ্যে অন্তর্কলহই পরাজয়ের কারণ।

নলহাটিতে দুটি উল্লেখযোগ্য হার হলো— তৃণমূল নেতা বিপ্লব ওঝা দুটি ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে দুটিতেই পরাজিত হয়েছেন। ইনি চেয়ারম্যান পদ-প্রার্থী ছিলেন। অপরদিকে প্রণবপুত্র অভিজিৎ মুখার্জির নিজের গড়ে কংগ্রেসও পরাজিত। কুপার্স-এ কংগ্রেস তার শক্তি প্রদর্শন করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেস এই পুরসভাটি নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে।

নলহাটিতে দুটি উল্লেখযোগ্য হার হলো— তৃণমূল নেতা বিপ্লব ওঝা দুটি ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে দুটিতেই পরাজিত হয়েছেন। ইনি চেয়ারম্যান পদ-প্রার্থী ছিলেন। অপরদিকে প্রণবপুত্র অভিজিৎ মুখার্জির নিজের গড়ে কংগ্রেসও পরাজিত।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ৬টি পুরসভার নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে যে একা লড়ে তৃণমূলের অগ্রগতি হয়েছে। কংগ্রেস তার ভিত্তিতে জয়ী হয়েছে। সিপিএমের 'ঘুরে দাঁড়ানো' ব্যর্থ হয়েছে। হলদিয়াতে লক্ষ্মণ শেঠ-এর গোষ্ঠীর প্রভাব এখনও আছে। এই নির্বাচনের ফলাফলে উদ্দীপ্ত উত্তেজিত হয়ে তৃণমূল জোট শরিককে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-তৃণমূলের ফারাকটা বেড়ে গেছে। মমতা আরও আক্রমণমুখী হবেন। ইতিমধ্যেই মার্কিন পত্রিকা লিখেছে মমতা প্রধানমন্ত্রীর থেকে বেশি ক্ষমতাশীল!

সিপিএমের সাংগঠনিক সঙ্কট এখনও বেড়েই চলেছে। দলের আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু সম্প্রতি দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। কয়েকটি জেলার বিশেষ করে কলকাতা জেলা পার্টির সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন না-হওয়াতে ব্যক্তিগত রেষারেষি বেড়েছে। রবীন দেব কেন্দ্রীয় কমিটিতে না যেতে পারায় ক্ষুব্ধ। রবীনবাবুকে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে অসুস্থ বৃদ্ধ শ্যামল চক্রবর্তীকে বসানো হয়েছে। তবে শ্যামলবাবু একটা ধাক্কা খেলেন। তাঁর বৃহত্তর বামপন্থী সাংস্কৃতিক মঞ্চ গঠনের ভাবনা-চিন্তা প্রাথমিক স্তরেই সিপিএম আই (এম-এল) লিবারেশনের অসহযোগিতায় ভেঙে গেল।

হলদিয়া নির্বাচনের ফলে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীয় সদস্য দীপক সরকার শক্তিশালী হলেন। অপরদিকে দুর্গাপুরের পুরসভার নির্বাচনে সিপিএম পরাজিত হওয়াতে রাজ্য-সিপিএমের বর্ধমান গোষ্ঠী তথা বর্ধমানের জেলা সম্পাদক এবং নিরুপম সেন সমালোচনায় পড়বে। মদন ঘোষের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে।

এতগুলি পুরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির অবস্থান নেই বললেই চলে। শুধু সিপিআই ও আর এস পি ২/১টি আসনে জিতেছে। সিপিএম সাংগঠনিক সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছে। এই সঙ্কট কিন্তু শুধু রাজ্যস্তরের নেতৃত্বে আটকে নেই, কেন্দ্রীয় স্তরেও পৌঁছে গেছে। সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত-এর নিজ রাজ্য কেরলে তীব্র দলীয় সঙ্কটে পার্টি ভেঙে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে রেজ্জাক মোল্লার বিদ্রোহ এবং অনিল বসুকে বহিষ্কার করায় পরবর্তী অবস্থাও সঙ্গীন হবে। এদিকে নন্দীগ্রামে সিবিআই তদন্তের গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে জড়িয়ে ফেলতে চাওয়া হচ্ছে। আবার কঙ্কাল কাণ্ডে দীপক সরকারকেও জড়ানো হতে পারে।

শাহরুখের 'ডন টু' হিট করেনি, হলদিয়ায় 'লক্ষন-টু'ও ফ্লপ

মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী,
সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেস,

অমিতাভের ডন ছিল সুপার ডুপার হিট। কিন্তু শাহরুখের ডন টু বক্স আপিসের দোরগোড়া থেকেই ফিরে এসেছে। বারবার 'মে আই কাম ইন স্যার' বলেও সাড়া পায়নি। এই রিমেকের যুগে শুভেন্দুবাবু আপনার হালও সেই কিং খানের মতোই হলো। হলদিয়া 'লক্ষ্মণ টু' চায় না।

অনেক কষ্টে এক লক্ষ্মণকে ঘাড় থেকে নামিয়েছে হলদিয়াবাসী। কিন্তু লক্ষ্মণের দোসর লক্ষ্মণকে আর চায় না। তাই তো পুরভোটে আপনাকে পুরো ফেল করিয়ে ছেড়েছে। অনেকে বলছে হলদিয়ায় সিপিএম টিকে গেল। কিন্তু আমি বলি, আপনি মানুন আর না-ই মানুন আসলে কিন্তু আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছে। হতে পারে আগে থেকেই ওই পুরসভা সিপিএমের হাতে ছিল। লক্ষ্মণ শেঠের কবি স্ত্রী তমালিকা পণ্ডা শেঠ ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু ২০০৭ আর ২০১২ সালের মধ্যে যে অনেক ফারাক। রাজ্যে আপনারা ক্ষমতায় আছেন সেটা ধরছি না। তা ছাড়াও একের পর এক নির্বাচনে প্রমাণিত যে পূর্ব মেদিনীপুর এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গ। তাই আসল রেজাল্ট হলো তৃণমূলে দুর্গে জিতে গেলেন তমালিকা।

এবার পুরভোটে সবারই অঙ্ক ছিল শংকর সিংয়ের কুপার্স ক্যাম্প আর বাকি সর্বত্র তৃণমূল রাজ। তেমন তেমনই হয়েছে। শুধু হলদি নদীর ধারেই ফুটল না ঘাসফুল। কিন্তু রাজনৈতিক পাটিগণিত বলছে ওটাই ছিল সব থেকে নিশ্চিত জয়। কিন্তু সেটা কেন হলো না? শুভেন্দুবাবু জনগণের রায়টা কি পড়তে পেরেছেন?

একটা সময় সবাই জানত হলদিয়া হলো লক্ষ্মণ শেঠের খাস তালুক। কিন্তু নন্দীগ্রামের ঝড়ে প্রথমে লোকসভা ও পরে বিধানসভা ভোটে সে দুর্গে ফাটল ধরে যায়। তারও আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদও বাম দখল মুক্ত হয়ে যায়। রূপনারায়ণ থেকে হলদি নদী গোটা জেলায় উদিত হয় নতুন নাম। বাংলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব পছন্দের শুভেন্দু অধিকারী। বাবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী। তার থেকে বড় কথা মূল-তৃণমূল দুই মিলিয়ে পোড় খাওয়া রাজনীতিক। মেসো অখিল গিরি দীর্ঘদিনের বিধায়ক। ভাই দিব্যেন্দুও বিধায়ক। কাঁথি, তমলুক, দীঘা জুড়ে অধিকারী পরিবারের দাপটের অনেক বয়েস। শুভেন্দু, কাঁথি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাম আমলেই আপনি যে দাপট দেখিয়েছেন তাতেই বোঝা যেত একদিন আপনি ওপরে উঠবেন। এ হেন আপনাকে মমতা দিদির পছন্দ তো হবেই।

একদিন হলদিয়ার 'মুকুটহীন সম্রাট' ছিলেন লক্ষ্মণ শেঠ। মারাত্মক সব অভিযোগ কাঁধে করে তিনি এখন সপার্ষদ শ্রীঘরে। কিন্তু আপনি তো 'মুকুটহীন' নন। আপনার মাননীয় নেত্রী তো আপনার মাথায় যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতির মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। এবার আপনি আসরে নামলেন। হলদিয়া দখলের লড়াই শুরু করলেন। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলেন, যেই যায় হলদিয়ায়, সেই হয় লক্ষ্মণ। আর তার জবাব দিতেই হলদিয়ার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন, একজন লক্ষ্মণ শেঠকে সরিয়ে আর এক লক্ষ্মণ শেঠকে তাঁরা সিংহাসনে বসাবেন না।

রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছেন। আপনারাই স্লোগান তুলে সেটা চাইতে শিখিয়েছেন। আর গত একবছরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, একজন লক্ষ্মণ শেঠকে সরিয়ে আর এক লক্ষ্মণ শেঠকে তাঁরা সিংহাসনে বসাবেন না।

রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছেন। আপনারাই স্লোগান তুলে সেটা চাইতে শিখিয়েছেন। আর গত এক বছরে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজনীতিতে পরিবর্তন এক অলীক স্বপ্ন। বদল নয়, বদলাই আসল অস্ত্র। তাই শুধু পূর্ব মেদিনীপুরের ওই শিল্পনগরীই নয়, গোটা রাজ্যকেই বার্তা দিয়েছেন, পরিবর্তন মানে রঙ বদল নয়, সংস্কৃতির বদল। তাই যে বা যাঁরা ভবিষ্যতে লক্ষ্মণ হতে চাইবেন তাঁদেরই পরিণতি হবে নির্বাসন। যেমনটা ভোগ করছেন হলদিয়ার অরিজিনাল লক্ষ্মণ।

আরও একটা অপ্রিয় কথা বলে রাখি শুভেন্দুবাবু। পরামর্শটা মাথায় রাখলে কাজে দেবে। আপনার বাবার সঙ্গে কথা বললে তিনিও নিশ্চয়ই একই পরামর্শ দেবেন। মনে রাখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপগ্রহ ভালবাসেন, গ্রহ নয়। নক্ষত্র তো নয়ই। সে তার যতই আলো থাক। তাই যেটুকু পাচ্ছেন তাতেই সুখে থাকুন। আপনি কি জানেন, হলদিয়ার এই পরাজয়ে কালীঘাট খুশি না হলেও বেশ স্বস্তিতে। আপনি যে খবর রাখেন সেটা অবশ্য আমি জানি। তাই তো যুব সভাপতির দায়িত্ব ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু সেই অনুমোদন পাবেন না। আপনি যদি মুর্শিদাবাদের মতো পূর্ব মেদিনীপুরের অধীর চৌধুরী হতে চান তবে সেই গুড়ে শুধু বালি নয়, পাথর। দিদি শুভেন্দু 'কাঁটা' দিয়ে লক্ষ্মণ 'কাঁটা' তুলতে চেয়েছেন। আপনাকে হিরো বানাতে নয়।

আপনার সব থেকে বড় দোষ কি জানেন? আপনার মিটিংয়ে আজকাল ভিড় হয়। আপনি সেটাও তো চিৎকার করে বলেছেন। কিন্তু একবারও ভেবেছেন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে তাঁরই দলের অন্য কারও ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠবে কেন? অধিকারীবাবু, অধিকারের হিসেব রাখুন।

রাগ করলেন? করেননি! তাহলে আর একটা কথা বলি। হলদিয়া জয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ঠোঁটের কোণে এই হাসি এই মেঘ। ফল প্রকাশের দিন তো সাংবাদিক সম্মেলনই করেনি। কী বলা যায় সেটা ঠিক করতেই পারেননি বিমানবাবুরা। আসল কারণ, লক্ষ্মণ ভূত। ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে দশা। তারপর আচমকাই বোকা বোকা আস্ফালন, হলদিয়ার রায় লক্ষ্মণ শেঠকে মুক্তি দেওয়া হোক। মামাবাড়ির আব্দার। জনতার রায় দিয়ে আদালতের রায় বিচার করতে চাইছে! সিপিএমের মনে রাখা উচিত, লক্ষ্মণ 'টু' কে যাঁরা হারিয়েছেন, তাঁরা আসলে সব লক্ষ্মণকেই ধিক্কার জানিয়েছেন। আসল লক্ষ্মণকে তো বটেই।

— **সুন্দর মৌলিক**

শিখণ্ডী পরিসংখ্যান

কংগ্রেসী সংস্কারেই গভীর আর্থিক সঙ্কটে দেশ

এন. সি. দে

আজকের পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন লাগাতার আর্থিক মহোৎসবে মেতেছেন; অনুৎপাদক, পরিকল্পনা বহির্ভূত ক্ষেত্রে যথেচ্ছ অর্থ অনুদান, খেতাব দান, মোল্লা-মৌলভী পোষ্যদান হিসাবে বিলোচ্ছেন। রাজীব গান্ধীও ক্ষমতায় এসেই শুরু করেছিলেন একইরকম আর্থিক নয়ছয়ের ভারত উৎসব। মমতার মহোৎসব পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজীবের মহোৎসব কিন্তু দেশের মধ্যেও সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের বাইরে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ওর মাথায় ঢুকেছিল ভারতকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করাতে হবে, তাই দেশে দেশে করা হোত ভারত-উৎসব। ওর মাথায় আরও চেপেছিল ভারতকে প্রযুক্তি-নির্ভর অগ্রণী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে তিনি শুরু করেছিলেন দেদার প্রযুক্তি আমদানি। সেই সময় চরম আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো হাতে স্বর্গ পেল। তারা তাদের শোষণের হাতিয়ার ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ-এর মারফত ঋণ যোগাতে লাগল। অচিরেই ভারত জড়িয়ে পড়ল এগুলোর ঋণের শর্তের জালে। সই করতে বাধ্য হল আর্থিক সার্বভৌমত্ব-বিরোধী ডাংকেল চুক্তি। তারই পরিণতিতে বিনা শর্তে ঢুকতে হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO)-এর সাইনবোর্ডের আড়ালে ওয়েস্টার্ন ট্রেড অর্গানাইজেশনে আদতে যা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বাণিজ্যতরী।

এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ সালে নয়া প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও বাধ্য হলেন ইউরো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দের একজনকে অর্থমন্ত্রী করতে। আজকের প্রধানমন্ত্রী সেইদিনের সেই মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী হয়েই তার প্রভুদের নির্দেশে সংসদে ঘোষণা করেছিলেন নয়া আর্থিক নীতি ও নয়া শিল্পনীতি, যার পোশাকি নাম উদারীকরণ (liberacisation) ও বিশ্বায়ন (globalisation); গোদা বাংলায় যার নাম বেসরকারিকরণ (Privatisation) ও ব্যক্তি পুঁজির পীঠস্থান সাম্রাজ্যবাদীর কাছে দেশকে বে-আব্রুকরণ। এই সময় থেকেই শুরু হয় আর্থিক সংস্কারের বুলি কপচানো। আসল উদ্দেশ্য নেহরু-ইন্দিরার আমলের মূল শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতির মুণ্ডপাত করা। নয়া অর্থনীতি ও নয়া শিল্পনীতির সওদাগর সেইদিনের সেই অর্থমন্ত্রী আজও ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ২১ বছর পর দেশের আর্থিক অগ্রগতি যখন ক্রমশ নিম্নগামী, শিল্পোৎপাদন প্রায় শূন্যে নেমে গেছে, রাজকোষ ঘাটতি, রাজস্ব ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিপোজিট ঘাটতি, টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্যের দ্রুত অবনমন ইত্যাদি নিত্য ঘটে চলেছে, তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রী কথায় কথায় আর্থিক সংস্কারের দোহাই দিয়ে চলেছে। সরকারের আমলাবাহিনী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল তথাকথিত অর্থনীতিবিদগণ তাদের সেবাদাস পত্র-পত্রিকাগুলিতে লাগাতার সব ঘাটতি রোগের একটিই মহৌষধ আর্থিক সংস্কারের গান গেয়ে বলেছেন। যার একটাই উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে ভেঙ্গে ফেলো; বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের নাম করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে বিদেশী পুঁজির অধীন করে তোলো। এখন দেখা যাক, ''আর্থিক সংস্কার'' বলতে কী বোঝায়? ভারতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাবে গত ২১ বছরে কী অগ্রগতি হয়েছে? সংস্কার শব্দের অর্থ সাধারণভাবে ধরা হয় নবীকরণ, ঘষা-মাজা বা খনন করা যেমন পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি সংস্কার করা, অর্থাৎ এই সংস্কারের লক্ষ্য সব সময় শুভ। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কিন্তু শুভ নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের কাছে আর্থিক সংস্কারের অর্থ হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিকে মূলধনী অনিয়ন্ত্রিত বাজারে পরিণত করা। এদেশের সমাজ, সংসার, সংস্কৃতি ও সম্পর্ককে বাজারের পণ্যে পরিণত করা। এই আর্থিক সংস্কার সম্বন্ধে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বর্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গত জানুয়ারি মাসে কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ৪৬তম কনভোকেশনের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সামনে ভারতকে অন্ধভাবে মার্কিন নীতি অনুসরণ করার পথ থেকে সরে আসতে অনুরোধ করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'ভারতের উচিত নয় দেশের মূলধনী বাজারের দরজা পুরোপুরি খুলে দেওয়া কারণ তা আর্থিক অস্থিরতার জন্ম দেবে।' তার মতে, এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে এই ধরনের উদারীকরণ-মার্কা আর্থিক সংস্কার কখনই দ্রুত উন্নয়ন ঘটায় না, বরং অর্থনীতিকে অস্থির করে তোলে এবং এই অস্থিরতার বলি হয় দরিদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। আর্থিক উদারীকরণ সমাজে ব্যাপক অসাম্য সৃষ্টি করে।' জি ডি পি বৃদ্ধি অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতির পরিসংখ্যান নিয়ে যে তরজা চলছে বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংস্থার মধ্যে, সে সম্পর্কে স্টিগলিজের মত, এই এক জিডিপি-পুজো শুরু হয়েছে যা আলাদীনের প্রদীপের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এটার বৃদ্ধির উপর এমন জোর দেওয়া শুরু হয়েছে, যেন মনে হচ্ছে এটা বাড়লেই সমাজ সব সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। আমেরিকার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'আমেরিকা তো জিডিপি-তে উচ্চস্তরের দেশ, তাহলে কেন আর্থিক সংকটের কবলে পড়ল? এই দেশ ঋণের পাহাড়ে গড়ে উঠেছে যার ভিত্তি হলো সুউচ্চ অট্টালিকার মতো এক একটি বুদবুদ্। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে চাপ দিয়ে মূলধনী বাজার অর্থনীতি চালু করার পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রধান অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন কিন্তু এই স্টিগলিজই। তাঁর অবদানের জন্য তিনি ২০০১ সালে নোবেল পুরস্কারও পান। এবার আসুন, স্টিগলিজের আর্থিক সংস্কারের তত্ত্ব ভারতের উপর কতটা সঠিক বা বেঠিক তার বিচার করি। প্রথমেই দেখা থাক, আমাদের বাণিজ্য থেকে কত লাভ হলো। বিদেশে ঘন ঘন নেতাদের ভ্রমণ, বিদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক যে সমস্ত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আমাদের মন্ত্রীরা করে আসছেন, তা থেকে তো আমাদের লাভই

উদ্দেশ্য। কিন্তু আদতেই তা হচ্ছে না। কারণ আমরা শুধু অন্য দেশের জিনিস কিনছি, বিক্রি করছি কম। যার ফলে ঘরের টাকাই চলে যাচ্ছে। ঘরের গচ্ছিত টাকায় ঘাটতি বাড়ছে— একে অর্থনীতির ভাষায় বলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট (চালু হিসাবের খাতায় ঘাটতি)। এটা চলছে সেই ২০০৪-০৫ সালে কংগ্রেস আমল শুরু হওয়ার পর থেকেই। মনে রাখতে হবে এই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট দেশের স্থায়িত্ব নষ্ট করে দিতে পারে। কারণ এর সঙ্গে যুক্ত আছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার।

একদিকে আমদানি বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার কমে চলেছে, অন্যদিকে আমদানি বাণিজ্যে একান্ত বিনিময় মুদ্রা ডলারের তুলনায় টাকার দাম নামতে নামতে ঐতিহাসিক তলানিতে ঠেকেছে। আজ আমাদের মুদ্রা টাকা বিশ্বের সবচেয়ে under- valued currency-তে পরিণত হয়েছে। টাকার মূল্য আজ ডলারের তুলনায় ৬১ শতাংশেরও নীচে চলে গেছে। এই টাকার অবমূল্যায়ন রুখতে সরকারকে যথেচ্ছ ডলার বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। জানা যাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে যে পরিমাণ মুদ্রা আছে তাতে মোটে ৬ মাস আমদানি করা চলতে পারে। তারপর? তারপর মার্কিন দাদাগিরির শিকারে পরিণত হওয়া। বাজপেয়ি সরকারের আমলে যে বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার ঐতিহাসিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, সেই ভাণ্ডার প্রতি বছরই কমতে কমতে ২০১১-র সেপ্টেম্বরের শেষে নেমে দাঁড়ায় ২৭৫.৬৯৯ বিলিয়ন ডলারে। এদিকে বিদেশী ডলারের তুলনায় দেশীয় টাকার মূল্য কমতে কমতে প্রায় ৫৬ টাকায় পৌঁছে গেছে।

এই বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম একটি কারণ হলো শিল্পোৎপাদনে ক্রমাবনতি।

এই শিল্প উৎপাদনহীন অবস্থার ফলস্বরূপ আর্থিক লেনদেনে মুদ্রার সরবরাহও কমে গেছে মারাত্মক ভাবে। মার্চ ২০১০-এ এই হার ছিল ১৮ শতাংশ; সেপ্টেম্বর '১১-য় এই হার নেমে দাঁড়ায় ৪ শতাংশে। এই হারই হলো একটি দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের প্রতিচ্ছবি। ব্যাঙ্ক-এ পাবলিক জমাও কমে গেছে ৬ শতাংশ। এইসবের নীট ফল হলো রাজকোষ ঘাটতির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। প্রতি বাজেটেই খরচ কমানোর বুলি আওড়ানো হয় ঘটা করে। কিন্তু ভোটে জিতে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সামাজিক ক্ষেত্রে দানছত্র খুলে দলীয় ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখার চেষ্টা চলতে থাকায় রাজকোষ ঘাটতি কমানোর লক্ষ্য মাত্রাও ঠিক মতো রক্ষা করা যাচ্ছে না। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে রাজকোষ ঘাটতি ধরা হয়েছিল ৪,১২,৮১৭ কোটি টাকা যা ছিল জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ; বছরের শেষ দিকে এই লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে করা হয় ৫,২১, ৯৮০ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৫.৯ শতাংশ। প্রকৃত রাজকোষ ঘাটতি কত হয়েছে এখনও কেন্দ্র সরকার তা প্রকাশ করেনি। ২০১২-১৩ বছরে এই ঘাটতি ধরা হয়েছে ৫,১৩,৫৯০ কোটি (৫.১ শতাংশ)। কোথায় দাঁড়ায় এই ঘাটতি দেখা যাক। একটি রাস্তাই সরকারের কাছে খোলা আছে তা হলো ঋণ করা। ২০১১ সালের বাজেটের পরে সরকার ৪.১৭ লাখ কোটি টাকা ঋণ করার পরিকল্পনা করেছিল; ২০১০-এর বাজেটের পর পরিকল্পনা করেছিল ৪.৪৭ লক্ষ কোটি ঋণের। ২০১১-র সেপ্টেম্বরের শেষে এই বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়াও রয়েছে স্বল্পকালীন ঋণের বিপুল বোঝা যা ডিসেম্বর '১০-এর শেষে পৌঁছে যায় ২৯৭.৫ বিলিয়ন ডলারে।

এবার আসি সেই বিতর্কিত জিডিপি পরিসংখ্যানের তথ্যে। ১১-১২ সালের বাজেটে জিডিপি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৯ শতাংশে। প্রকৃতপক্ষে বছরের শেষে সি এস ও এই বৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশের বেশি হবে না বলে জানিয়ে দেয়। ২০১২-১৩'র বাজেট পেশের আগেই প্রধানমন্ত্রীর ইকোনমিক অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল জিডিপি'র আনুমানিক বৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশ হবে বলে ঘোষণা করে। অথচ বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী এই হার ৭.৬ শতাংশ হবে বলে ঘোষণা করেন। আর এম এফ প্রধান বলেন, এই হার ৭.৩ শতাংশ হতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সার্ভে রিপোর্টের মতে, এই হার ৭.২ শতাশের বেশি হবে না। এইরকম নানা মুনির নানা মত প্রায়ই সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কে সঠিক তা বলা কঠিন। তবে একথা বলা কঠিন নয় যে কেন্দ্রের সনিয়ার পরামর্শে চলা সরকারটি শুধুমাত্র অযোগ্য, অপদার্থ, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা সরকারই নয়, এটি একটি দুর্নীতিগ্রস্ত শিরোমণিদেরও সরকার। এই সরকার দেশকে একটি শক্তিশালী উর্ধ্বমুখী আত্মনির্ভর অর্থনীতি উপহার দিতে তো পারেইনি, উল্টে আজ এই সরকার পরিসংখ্যানেও কারচুপির আশ্রয় নিচ্ছে। সিবিআই-কে এই সরকার যেমন তাদের পার্টির পোষা কুত্তা বানিয়ে ফেলেছে। সি এ জি-কেও এই সরকার তাদের আজ্ঞাবহ বানিয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা সি এস ও-কেও একইরকম ভাবে পরিসংখ্যান তৈরিতে প্রভাবিত করে চলেছে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন হলেই এই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে কাজে লাগিয়ে সেই অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে নানাভাবে বিব্রত করে চলেছে। বিপরীত দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পণ্যমূল্য ছাড়া আর সব পরিসংখ্যানকেই উর্ধ্বমুখী করে দেখানো হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের আগে যেমন পণ্যমূল্য-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান WPI/ CPI-একেবারে শূন্যে নামিয়ে দেখানো হয়েছিল। শিল্পোৎপাদন, জিডিপি পরিসংখ্যানে ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছিল। নির্বাচনের ঠিক পরে সাধু সেজে সেই পরিসংখ্যানে ভুল স্বীকার করেও নেওয়া হয়েছে। ততক্ষণে নির্বাচনে কেল্লাফতেও হয়ে গেছে।

২০১০-১১-র বাজেটে অর্থমন্ত্রী হেঁয়ালি করে বলেছিলেন ''আমি খরচ বেশি করেছি, তথাপি আমি রাজকোষ ঘাটতি ৫.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে রেখেছি ৫.১ শতাংশে''। কী করে সম্ভব হলো? প্রকৃতপক্ষে রাজকোষ ঘাটতি ২০, ০০০ কোটি বেড়ে গিয়েছিল। তাহলে ঘাটতির শতাংশ কমে গেল কী করে? খুবই রহস্যজনক মনে হচ্ছে না। আসলে সমস্ত ঘাটতির হিসাবই তো হয় জিডিপি'র উপর। জিডিপি বাড়লে তার নিরিখেই সব ঘাটতির শতাংশ হার ঠিক হয়। রাজকোষ ঘাটতি ছিল জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ। ১০-১১-র পণ্যমূল্যের হারে জিডিপি'র মূল্য ছিল ৬৯.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় (মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়) বর্তমান পণ্যমূল্য হারে জিডিপি-র মূল্য হয়ে যায় ৭৮.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা বেশি। মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে জিডিপি-র পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়, তার শতাংশের হারও কমে যায়। প্রণববাবুর কাছে মুদ্রাস্ফীতিই হলো তুরুপের তাস। কংগ্রেসের তৈরি ভারতীয় অর্থনীতি এক গোলক ধাঁধা। এক অর্থনীতিবিদ তাই বলেছেন, ভারতীয় অর্থনীতি একটি ক্লান্তিকর বিষয়। সরকার যেন এক মদ্যপ যিনি ঋণ করেন শুধুই মদ কেনার জন্য। স্টিগলিজ-র কথায় আবার ফিরে আসি। আর্থিক সংস্কার অর্থনীতিতে আনে শুধুই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা আর দুর্নীতি। ভারতের উচিত নয় মার্কিনী মূলধনী বাজার উদারীকরণের তত্ত্ব অনুসরণ করা। এর ফলে ভারতের দরিদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প বিলীন হয়ে যাবে।

শরীরং রথমেব তু

নবকুমার ভট্টাচার্য

আদি শঙ্করাচার্য তাঁর 'জগন্নাথ অষ্টকম্' স্তোত্রের পঞ্চম শ্লোকটিতে লিখেছেন, জগন্নাথ স্বামীর রথ পথে বের হলে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভক্তরা তাঁর স্তবগানে মুখর হয়। সেই স্তব শুনে দয়াসিন্ধু এবং সর্বলোকের মিত্রস্বরূপ জগৎস্বামী তাঁদের প্রতি করুণায় আর্দ্র হন। দয়াসিন্ধু জগন্নাথের রথযাত্রা তাই আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। তিনি যেহেতু সর্বজীবের মিত্র, সেহেতু তাঁর রথযাত্রা যতটা না দৈবী তার থেকে অনেক বেশি মানবিক। রথযাত্রাকে পতিতপাবন যাত্রা বলা হয়। কারণ প্রভু জগন্নাথ হচ্ছেন পতিতপাবন। অর্থাৎ তিনি হলেন পতিতের ভগবান। ছাপান্ন ভোগ খাইয়ে তাঁকে যতই বুর্জোয়া বড়লোকের দেবতা বানানোর চেষ্টা করা হোক না কেন আসলে তিনি অবহেলিত সমাজের আরাধ্যদেবতা। তাই তাঁর রথযাত্রার উৎসবে ভক্তের এত উন্মাদনা। তাই রথের রশির স্পর্শ পাওয়ার জন্য রথের চাকায় পিষ্ট হওয়ার ভয়কেও মানুষ দূরে সরিয়ে রাখে। কারণ প্রভু জগন্নাথই তামাম দুনিয়ার মালিক। প্রখ্যাত পণ্ডিত দিবাদক দাস তাঁর 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থে লিখছেন— ঈশ্বর উপরে ঈশ্বর। পরম পরে পরাবার। ব্রহ্ম উপরে ব্রহ্ম এহি। কৃষ্ণ উপরে কৃষ্ণ সেহি। অনাদি উপরে অনাদি। সর্ব কারণ পর সিদ্ধি। শ্রী জগন্নাথ শ্রীমুরতি। এখুঁটি সর্ব উৎপত্তি।' তাই রথযাত্রার উৎসবে রথে অবস্থিত প্রভু জগন্নাথ দেবকে রথের মধ্যে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। জাগতিক দুঃখকষ্টের হাত থেকে চির মুক্তি ঘটে তার। অবশ্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্তক ভগবান বৈবস্বত আত্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে নচিকেতাকে বলেছেন, মানুষের শরীরটাই যেন একটা রথ। কঠোপনিষদে সেই রথের এক অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে। আমাদের শরীররূপ সেই রথখানি অবিরাম বিষয় পথে ছুটে চলেছে। মানব দেহের ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে এই রথের ঘোড়া। আমাদের বুদ্ধিরূপ সারথি মনরূপ লাগাম জুড়ে দিয়ে ইন্দ্রিয় রূপ ধাবমান ঘোড়াগুলির গতিকে সবলে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। আর সেই রথের অধিপতি হচ্ছে আত্মা— যা স্থির অঞ্চল শান্ত মূর্তিতে রথের ওপর বিরাজিত। ছুটে চলেছে— মহাকালের রথচক্র। সুখ দুঃখের অনন্ত পথে— 'চক্রানি পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।' জন্মমৃত্যুর তালে তালে চলে অনন্তকালের রথযাত্রা। মহাভারতে এই রথের চাকার চক্রান্তে কর্ণকে জীবন দিতে হয়েছিল। কর্ণের চক্রের মতো মানুষের সৌভাগ্যরথ যদি বিফল হয় তবে জীবনের গতিচক্রে আসে অনিবার্য বিপর্যয়।

রথ নিয়ে বাঙালির উৎসবের অন্ত নেই। রথের একটা সর্বভারতীয় চেহারা থাকলেও বাঙালির রথ নিয়ে উৎসবের সুরটা একটু অন্যরকমের। হুতোম রথযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন : ''ক্রমে রথ এসে পড়লো। ফ্যাতো র‍্যাতো পরব প্রলয় বড্ডুটে, এতে ইয়ারকির লেশমাত্র নেই। সুতরাং সহরে রথ পার্বণে বড় অ্যাক্টা ঘটা নাই, কিন্তু কলিকাতার কিছু ফাঁকা যাবার নয়! রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠলো— ছোট ছোট ছেলেরা বার্নীসকরা জুতো... সেপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পোরে, কোমরে রুমাল বেঁধে চুল ফিরিয়ে চাকর চাক্‌রাণীদের হাত ধরে পয়নালার ওপোর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারাণ্ডায় রথ দেখতে দাঁড়িয়েছে।

আদ্‌বইসি মাগিরা খাতায় খাতায় কোরা ও কলপ দেওয়া কাপড় পোরে রাস্তা যুড়ে চলেছে; মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতের ভেঁপু, পাখা ও সোলার পাখি বেধড়ক বিক্রী হচ্ছে; ছেলেদের দ্যাখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্ছেন; রাস্তায় ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ শব্দের তুফান উঠেছে— ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল, খত্তাল ও লোকের গোলের সঙ্গে অ্যাকখানা রথ এলো— রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুন্তি, ভোড়োং ও নেড়ির কবি, তারপর বৈরাগীদের দু-তিন দল নিমখাসা কেত্তন; তার পেছনে

সকের সংকীর্ত্তন গাওনা। দোয়ার দলের সঙ্গে বড়বড় আট্‌চালার মতো গোলপাতার ছাতা ও পাখা চলেছে, আশেপাশে কর্ম্মকর্ত্তারা পরিশ্রান্ত ও গলদঘর্ম্ম— কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত। কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত, সখের সংকীর্ত্তনওয়ালারা গোচসই বারাণ্ডার নীচে, চৌমাথার ও চকের সাম্‌নে থ্যেমে থ্যেমে গান করে যাচ্চেন, পেচোনে চোতাদারেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্চেন; দোয়ারেরা কি গাচ্চেন। তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুজ্‌তে পাচ্চেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর অ্যাক্‌টা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাত্‌লাম সুরে

কে মা রথ এলি
সর্ব্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চুড়োর উপর মুক্‌পোড়া
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চল্‌চে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাকা
বেহদ্দ ছেনানী।

গানটি গেয়ে—মা রথ। প্রণাম হইমা। বোলে প্রণাম কোল্লে। এদিকে রথ হেল্‌তে দুল্‌তে বেরিয়ে গ্যাল...।"

কথামৃতেও কলকাতার রথযাত্রার বিবরণ মেলে। গ্রামবাংলার রথেরও বিবরণ রয়েছে সেকালের পত্রপত্রিকায়। ১৬৫০ শকাব্দে হুগলী জেলার দশঘরাতে তিনখানি রথ বের হোত। একটি একুশ চূড়া, একটি তের চূড়া ও একটি ন চূড়ার। ১৭৪৯ শকাব্দে এই তিনটির পরিবর্তে একটি রথ তৈরি হয় এবং ১৮৩৬ সালে যে রথটি নির্মিত হয় সেটাই দশঘরার রথ। এই হুগলী জেলাতেই রয়েছে গুপ্তিপাড়ার রথ যা আদতে কৃষ্ণবাটির রথযাত্রা নামে শুরু হয়। তখন বাংলার নবাব ছিলেন আলিবর্দি খাঁ সেই সময় বিশাল আকারের ত্রিতল রথে তেরটি চূড়ো ছিল। পরবর্তীকালে চলন্ত রথের চাকায় সাতজন মানুষ মারা যাওয়ার পর নতুন করে ছোট আকারের নয় চূড়ো বিশিষ্ট রথ তৈরি হয়। সেই ট্রাডিশন আজও চলছে। ১৭৯৩ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ বলরাম বসুর পিতামহ কৃষ্ণরাম বসু একটি সুদৃশ্য উচ্চ কাঠের রথ তৈরি করিয়ে দেন মাহেশের জন্য। কালের নিয়মে ওই রথ নষ্ট হয়ে গেলে ১৮৩৫ সালে কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বসু একটি রথ তৈরি করিয়ে দেন। ওই রথটি অগ্নিদগ্ধ হলে ১৮৫২ সালে কালাচাঁদ বসু অপর একটি রথ তৈরি করিয়ে দেন। সেই রথও পরিত্যক্ত হলে অবশেষে ১৮৮৫ সালে দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র বসুর অর্থে একটি লোহার রথ তৈরি হয় মার্টিন বার্ন কোম্পানি থেকে। সেই রথটি আজও চলছে। মহিষাদলের রাণী জানকী অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে সতেরো চূড়া বিশিষ্ট একটি রথ নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৫২ সালে লছমনপ্রসাদ গর্গ সংস্কার করে রথটিকে তেরো চূড়ায় পরিণত করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার যাদেকবাগের জগন্নাথের রথ নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন নাটোরের রাজা। তাঁরই আগ্রহে উৎসাহে সতেরো চূড়া রথ নির্মিত হয়।

কলকাতার প্রাচীন রথগুলির মধ্যে শোভারাম বসাকের রথ ছিল বেশ নামকরা। ওই রথটা রাখা হোত গঙ্গার ধারে। পরে রথের জন্যই ওই স্থানের নাম হয় রথতলার ঘাট। চোরবাগানের মল্লিকদের রথের হাঁক ডাক কম ছিল না। নীলমণি মল্লিক তাঁর মাতামহের কাছ থেকে জগন্নাথের বিগ্রহ পেয়ে চোরবাগান ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩১ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' মল্লিকদের রথযাত্রা সম্পর্কে লিখেছে। ''শ্রীশ্রী বিগ্রহের রথারোহণ হইলে রাজপথে গমন ও প্রত্যাবর্তনকালে খোল করতাল তুরী ভেরী শিঙ্গা মৃদঙ্গ ঢোল জগঝম্পাদির বিবিধ বাদ্যোদাম হইয়াছিল ও বাণ নিশানা ইত্যাদি অগ্রে ধাবমান ছিল।'

ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের রথ, সিমলার প্রামাণিকদের রথ ছিল দেখার মতো। কলকাতার আদিবাসিন্দা শেঠদের গৃহদেবতার নামে গোবিন্দজীর রথ ছিল সাততলা সমান উঁচু। লালদীঘি থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত সোজা রাস্তায় এই রথ টানা হোত। পোস্তায় জগন্নাথদেবের তিনখানা বড়ো মাপের সুসজ্জিত রথ পরিক্রমা করে গরাণহাটার লালাবাবুর বাড়ির উঠোনে সারাবছর অবস্থান করত। এছাড়াও পুরোনো কলকাতার ছোট- বড় অনেক রথ ছিল। এর মধ্যে চাঁপাতলার জয়নারায়ণ চন্দ্রের রথ, টালিগঞ্জের মণ্ডলদের রথ, চেতলার নজিরবাবুর রথ উল্লেখযোগ্য। জানবাজারের প্রীতিরাম মাড়েদের রূপোর রথ ছিল বিখ্যাত। পরে ওটা রাণী রাসমণির রথ নামেই খ্যাতি লাভ করে। ১৮৩৮ সালে তৈরি এই রূপোর রথের উচ্চতা ছিল ১৪ ফুট আর খরচ পড়েছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। এককালে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে রথ টেনেছিলেন। পাইকপাড়ার রাজবাড়ির রথের জৌলুস ছিল দেখার মতো। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় (১৭১০—১৭৮২ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত পিতলের রথটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় আজ আর তার পরিচয় জানার উপায় নেই। জনশ্রুতি রয়েছে— কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র নদিয়ারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় (১৭৮৮-১৮০২ খৃঃ) একবার নাকি রথের সময় জীবন্ত সাতটি শ্বেত অশ্ববহিত রথ চালনা করেছিলেন সারথি হিসেবে। ঈশ্বরচন্দ্রের সেই রথটিও আজ আর নেই। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির বর্তমান রথটি কাঠের তৈরি চাকা লোহার। রথের গায়ে কাপড়ের উপর পৌরাণিক চিত্র। ১৯৩৫ সালে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের বিধবাপত্নী জ্যোর্তিময়ী দেবী এই রথ প্রতিষ্ঠা করেন।

এক সময় রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ ত্যাগ করাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হোত। এর বিরুদ্ধে 'সমাচার দর্পণ' ও 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় বহু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। কালক্রমে এটিকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার সামিল বলে মনে করা হয় এবং তৎকালীন সরকার এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে এই প্রথাটি বন্ধ করে দেওয়ায় প্রথাটি বন্ধ হয়ে যায়।

‘শ্রীরামকৃষ্ণ কেল্লা’য় রথোৎসব

অর্ণব নাগ

‘বলরাম মন্দিরে’র এই চকমিলানো বারান্দাতেই রথ টেনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিটের (পরবর্তীকালে ঠিকানা পরিবর্তিত হয়ে অধুনা ৭নং গিরীশ অ্যাভিনিউ) বাড়িটি শ্রীরামকৃষ্ণ কেল্লা নামে পরিচিত। স্বয়ং রামকৃষ্ণ-ই এই বাড়িটিকে তাঁর ‘কেল্লা’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। বাড়ির মালিকের নাম না বললেও চলে, তিনি স্বনামধন্য বলরাম বসু। যাঁর পিতামহ গুরুপ্রসাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহের নামানুসারে ওই এলাকার নাম হয়েছিল শ্যামবাজার। ১৮৮২ সালে তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় দক্ষিণেশ্বরে। এবং তার পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত। সবার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। লুচি-মিষ্টি দিয়েই মূলতঃ আহার সারতেন তিনি। কিন্তু তাঁর কাছে বলরামের অন্ন ছিল ‘শুদ্ধ অন্ন’। তাই নির্দ্বিধায় একমাত্র বলরাম বসুর বাড়িতেই অন্নগ্রহণ করতেন তিনি। শতাধিকবার তিনি এই বাড়িতে এসেছেন। প্রতিবছর রথের সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বাড়িতে নিয়ে আসতেন বলরাম।

তবে এই বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের রথোৎসবে অংশ নেওয়ার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র একটি ক্ষেত্রে। সেটি কোন বছরে তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ‘কথামৃতে’র সূত্র অনুযায়ী ১৮৮৪ সালের ৩ জুলাই বৃহস্পতিবার উল্টোরথের দিন বলরাম বসুর বাড়ির রথোৎসবে অংশ নেন ঠাকুর। অন্যদিকে ‘লীলাপ্রসঙ্গে’র মতে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের সোজারথের দিনে রথযাত্রায় অংশ নেন তিনি। দু’টি আলাদা বছরের রথযাত্রার উল্লেখ বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। কারণ শ্রীম এবং সারদানন্দ প্রণীত ওই দুটি প্রামাণিক গ্রন্থের এ-প্রসঙ্গে পারিপার্শ্বিক বিবরণ পুরোপুরি এক। সেই বিবরণ অনুযায়ী, ২৫ জুন রথযাত্রার দিন ঠাকুর ঠনঠনেতে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে আলাপ করতে যান। এর মধ্যে ‘লীলাপ্রসঙ্গে’র বাড়তি তথ্য যে, সোজারথের দিনই সন্ধ্যায় বলরাম বসুর বাড়ির রথযাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ অংশগ্রহণ করে রাত্রিবাস করেন ও পরের দিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। ‘কথামৃত’ এরপর জানাচ্ছে, সোজারথ থেকে উল্টোরথ, মাত্র দিন সাতেকের ব্যবধানেই পণ্ডিত শশধর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং এরমধ্যেই একবার ঘুরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। এবং উল্টোরথের দিন ঠাকুরের নির্দেশে বলরাম বসুর আমন্ত্রণ পেয়ে চলে আসেন তাঁর বাড়িতে। ১৮৮৫ সালের ১৪ জুলাই ‘কথামৃতে’ বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুরের রথ টানার আংশিক বিবরণ রয়েছে। যার সঙ্গে ‘লীলাপ্রসঙ্গে’র পারিপার্শ্বিক বিবরণ একেবারেই মেলে না।

১৮৮৪ কিংবা ১৮৮৫ যে বছরই হোক, সোজারথ ও উল্টোরথ দু-দিনই বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের রথযাত্রার একমাত্র পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। ‘কথামৃতে’র সহজ বর্ণনা, ‘‘শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে, শ্রীশ্রী জগন্নাথের সেবা আছে, একখানি ছোট রথও আছে। তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্যাত্রা উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই ছোট রথখানি বারবাটীর দোতলার চকমিলান বারান্দায় টানা হইবে।’’ এই প্রসঙ্গে ‘লীলাপ্রসঙ্গে’র বর্ণনাটিও সুখপাঠ্য, ‘‘বলরামবাবুর বাটীতে রথে ঠাকুরকে লইয়া আনন্দের তুফান ছুটিত। অদ্য সন্ধ্যার পরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রী বিগ্রহকে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া অন্দরের ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আনা হইল। এবং বস্ত্রপতাকাদি দ্বারা ইতঃপূর্বে সজ্জিত ছোট রথখানিতে বসাইয়া আবার পূজা করা হইল। বলরামবাবুর পুরোহিতবংশজ ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত ফকীরই (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) ওই পূজা করিলেন।’’ পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই, ‘লীলাপ্রসঙ্গে’র বর্ণনা সোজারথের দিন আর ‘কথামৃতে’র বিবরণ উল্টোরথের।

আপাত ঘরোয়া পরিবেশে আর পাঁচটা গৃহস্থ বাড়ির মতোই সাধারণ লোকচক্ষুর বাইরে গৃহান্তরালের এই রথযাত্রার বিশেষ কোনও মূল্য থাকত না, যদি না উনিশ শতকের সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক ব্যক্তিটি তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে রথযাত্রাকে উপলক্ষ করে গোটা বাড়িটিকে (এবং পরবর্তীকালে গোটা সমাজকে) আনন্দের প্লাবনে না ডুবিয়ে দিতেন। সেই অর্থে রথযাত্রাটি ঐতিহাসিক। এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য চোখ রাখা যাক ‘লীলাপ্রসঙ্গে’ : ‘‘এই সংকীর্তন করিতে করিতে রথের টান আরম্ভ হইল। ঠাকুর স্বয়ং রথের রশি ধরিয়া অল্পক্ষণ টানিলেন। পরে ভাবাবেশে তালে তালে সুন্দরভাবে নৃত্য

করিতে লাগিলেন। সে ভাবমত্ত হুঙ্কার ও নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তখন আত্মহারা— ভগবদ্ভক্তিতে উন্মাদ! বাহিরবাটীর দোতলার চক্‌মিলান বারাণ্ডাটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকক্ষণ অবধি এইরূপ নৃত্য, কীর্তন ও রথের টান হইলে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং পরিশেষে তদভক্তবৃন্দ, সকলের পৃথক পৃথক নামোল্লেখ করিয়া জয়কার দিয়া প্রণামান্তে কীর্তন সাঙ্গ হইল। পরে রথ হইতে জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে অবরোহণ করাইয়া ত্রিতলে (চিলের ছাদের ঘরে) সাতদিনের মতো স্থানান্তরিত করিয়া স্থাপন করা হইল। ইহার অর্থ রথে চড়িয়া জগন্নাথদেব যেন অন্যত্র আসিয়াছেন; সাতদিন পরে পুনঃ এখান হইতে রথে চড়িয়া আপনার পূর্বস্থানে গমন করিবেন। জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে পূর্বোক্তস্থানে রাখিয়া ভোগনিবেদন করিবার পর অগ্রে ঠাকুর ও পরে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার সহিত আগত যোগেন (যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, পরবর্তীকালে যোগানন্দ স্বামী) সে রাত্রি বলরামবাবুর বাটীতেই রহিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা অনেকেই যে যাঁহার স্থানে চলিয়া গেলেন।"

'কথামৃতে' উল্টোরথের দিন শ্রীরামকৃষ্ণের রথ টানার বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাটি অনুপম। কেননা রথযাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের স্বকণ্ঠে সঙ্গীত শ্রবণ এবং নৃত্য-দর্শন— এই দুই মহার্ঘ্য দৃশ্যের দুর্লভ সাক্ষী হয়েছিল বলরাম বসুর আবাসগৃহ। 'কথামৃতে'র বর্ণনা," ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাহিরের দুতলার বারান্দার উপর আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুসুম ও পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়াছেন এবং অলঙ্কার ও নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন। বলরামের সাত্ত্বিকপূজা, কোনও আড়ম্বর নাই। বাহিরের লোক জানেও না যে, বাড়িতে রথ হইতেছে।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুখে অসিয়াছেন। ওই বারান্দাতেই রথ টানা হইবে। ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়াছেন ও কিয়ৎক্ষণ টানিলেন। পরে গান ধরিলেন— নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

গান— যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন ও গাইতেছেন। কীর্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ, সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও নৃত্যে যোগদান করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পরিপূর্ণ হইল। মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন! বোধ হইল, যেন শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে

যে রথ শ্রীরামকৃষ্ণ টেনেছিলেন।

মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বন্ধুবর্গসঙ্গে পণ্ডিতও রথের সম্মুখে এই নৃত্য-গীত দর্শন করিতেছেন।

এখন সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর বৈঠকখানাঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন।"

প্রসঙ্গত, এর পরের বছরের অর্থাৎ ১৮৮৫ সালের ১৪ জুলাইয়ের রথযাত্রার যে বর্ণনা 'কথামৃতে' আছে, তার সঙ্গে উপরের বর্ণনার চরিত্রগত মিল রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বাড়তি তথ্যের মধ্যে রয়েছে, সেবছর রথযাত্রায় বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (এর আগের বছর ছিলেন কিনা প্রমাণ নেই) এবং গৃহস্থ ভক্তরা ঠাকুরকে দর্শন করতে ও রথের সম্মুখে তাঁর কীর্তনানন্দ দেখতে তাঁদের পরিবারবর্গকে বলরাম-গৃহে এনেছিলেন।

যাইহোক, এরপরে শশধর পণ্ডিতকে মূলতঃ কীর্তন সম্পর্কে কিছু মূল্যবান কথা বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে রাখা দরকার রথযাত্রা উপলক্ষে কীর্তন এবং সেই কীর্তনকে কেন্দ্র করে তাঁর উপদেশ। সুতরাং এই উপলক্ষে ভক্ত ও ভগবানের সংযোগের যে সেতু ঠাকুর রচনা করেছিলেন তার সর্বত্রই রথের বাঙ্ময় উপস্থিতি কিন্তু ছিলই। শশধর পণ্ডিতকে ঠাকুর বলেছিলেন, "(কীর্তনের প্রসঙ্গে) এর নাম ভজনানন্দ, সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে— কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ, ভজন করতে করতে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন— তখন ব্রহ্মানন্দ।" শশধর পণ্ডিতের জিজ্ঞাস্য ছিল, "কিরূপ ব্যাকুল হলে মনের এই সরস অবস্থা হয়?" উপমা প্রিয় ঠাকুর বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে দর্শন করবার জন্য যখন প্রাণ আটুপাটু হয় তখন এই ব্যাকুলতা আসে। গুরু শিষ্যকে বললে, এসো তোমায় দেখিয়ে দি কিরূপ ব্যাকুল হলে তাঁকে পাওয়া যায়। এই বলে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলে। তুললে পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার প্রাণ কিরকম হচ্ছিল? সে বলে প্রাণ আটুপাটু কচ্ছিল।" একথা অনস্বীকার্য যে রথের অধিষ্ঠাত্রী তিন দেবতা— জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা-কে দেখেই ভাবাপ্লুত ঠাকুর বলেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ভালবাসা, এই সার! ভক্তিই সার।' রাম-নারদের কথোপকথনের উপমা দিয়ে বলেছিলেন, "নারদ রামকে বললেন, তোমার পাদপদ্মে যেন সদা শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রামচন্দ্র বললেন, আর কিছু বর লও, নারদ বললেন, আর কিছু চাই না,—কেবল যেন পাদপদ্মে ভক্তি থাকে।" ঐতিহাসিক রথোৎসবে চিরকালীন উপদেশ— বলরাম বসুর বাসভবন (রামকৃষ্ণের অজস্রবার পদধূলির সৌজন্যে বর্তমানে ভক্তদের 'বলরাম মন্দিরে'-এ পরিণত)-এর রথযাত্রা, লোকারণ্য মহাধূমধামময় পরিবেশকে নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

(আলোকচিত্র : শিবু ঘোষ)

পুরীর রথের টুকিটাকি

পুরীতে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হয়। তবে রথ তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয় বহু পূর্বে থেকেই। পুরীতে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আনুষ্ঠানিকভাবে রথ তৈরি শুরু হয়। বহু আগে রক্তচন্দন আর পদ্মকাষ্ঠ দিয়ে রথ তৈরি হোত, কিন্তু একালে সেই কাঠ পাওয়া যায় না। কিছুকাল আগে দশপলার ও রণপুরের জঙ্গল থেকে কাঠ আসত। দশপলার রাজা নিজেই সেই কাঠ যোগাতেন, কিন্তু এখন যোগান দেয় সরকার।

পুরীতে রথ তৈরির কারিগর ১৫০ জন। তাঁর বংশপরম্পরায় রথ বানিয়ে যাচ্ছেন। রথের মূল কাঠামোর ওপর পাটাতন দিয়ে তৈরি করা হয় মঞ্চ। সেখানেই থাকে সিংহাসন ঘর। এর ওপর লোহার রড আর কাঠের গুঁড়ি দিয়ে রথকে পুরীর মন্দিরের চূড়োর মতো সাজিয়ে তোলা হয়। পুরীতে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা তিনজনের রথ তিন রকমের।

পুরীতে জগন্নাথদেবের রথকে বলা হয় নান্দী ঘোষ বা গরুড়ধ্বজ। এই রথের চাকা থাকে ১৬টি আর তৈরি হয় ৮৩২ টা খণ্ড দিয়ে। জগন্নাথদেবের রথটাই সব থেকে উঁচু। এই রথের উচ্চতা ৩৩ হাত ১৫ আঙুল। এই রথের ধ্বজা তৈরি হয় চন্দনকাঠ দিয়ে। রথের সারথি হলো দারুকা। নান্দী ঘোষে অশ্ব থাকে চারটি— শাখ, বলা হক, শ্বেতা এবং হরিদাস। রথাধিপ হলেন গরুড়। এই রথ প্রথম তৈরি করেন বিশ্বকর্মা।

বলরামের রথকে বলা হয় তালধ্বজ। এই রথের চাকা থাকে মোট ১৪টি। আর তৈরি হয় ৭৬০টি কাঠের টুকরো দিয়ে। তালধ্বজের উচ্চতা ৩২ হাত ১০ আঙুল আর এই রথের সারথি হলেন মাতলি। রথের চারটি বাহক হলো তীব্র, ঘোঢ়, দীর্ঘশরণ এবং স্বর্ণনাভ। রথাধিপ হলেন বাসুদেব। আর সঙ্গে থাকেন তদন্তকারী, হরিহর, ত্রৈম্বাক, অঘোর, প্রলম্বরী, নটম্বর, ত্রিপুরশিব এবং মৃত্যুঞ্জয়। এই রথ প্রথম বানান ময়দানব।

সুভদ্রার রথের উচ্চতা ৩১ হাত। এর চাকা মোট ১২টি। সুভদ্রার রথকে বলা হয় দর্পদলন। এই রথ তৈরি করতে ৫৯০টি কাঠের খণ্ড লাগে। রথযাত্রার দিন সুভদ্রার গায়ে থাকে লাল ও কালোয় মেশানো পবিত্র বস্ত্র খণ্ড। দেবী দুর্গা থাকেন রথাধিপ হিসাবে। সারথি থাকেন অর্জুন। এই রথের চারটি অশ্বের নাম রুচিকা, মোচিকা, জিতা এবং অপরাজিতা। যে দড়িতে রথ টানা হয় তাকে বলা হয় স্বর্ণচূড়। এই রথে দেবী দুর্গা ছাড়াও থাকেন চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, হরচন্দ্রিকা, কাত্যায়নী, কালী, মঙ্গলা ও বিমলা।

ন.ভ.

নোট বুকের রাইটার চাই

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রিকোর্স (কল্যাণী, গৌড়, বর্ধমান) ও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাজেশন ভিত্তিক বই লেখার জন্য রাইটার চাই। যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে শীঘ্র এস. এম. এস. করুন।

৯৮৩২০৪৩৫১৫, ৯৭৩৫৯৪৮৭৯০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

চিঠিপত্র

গো-হত্যা অমার্জনীয় অপরাধ

প্রাচীনকাল থেকেই গোরক্ষাকে ভারতবর্ষে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো গোরু রাষ্ট্রের মহান সম্পদ ও হিন্দু সমাজে 'গো-মাতা' হিসেবে গণ্য হয়। তাই গোরক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রকেও কার্যত রক্ষা করা হয়। বস্তুত ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম আধার হলো গোরু। কিন্তু ১৪ মে স্বস্তিকা সংখ্যায় ভারত তৃতীয় সর্বাধিক গো-মাংস রপ্তানীকারক দেশ হতে চলেছে প্রতিবেদনটি হিন্দু ধর্ম তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এঘটনা যেভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে তাতে দেশের প্রশাসনিক দুর্বলতা প্রকট হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। মূলত প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে গো-মাংস বা গো-পাচারের ঘটনা ঘটে থাকে। স্বস্তিকার ২১ মে সংখ্যায় একটি প্রতিবেদনে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্যই ভারতীয় সমাজ তথা সংস্কৃতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কয়েক বছর আগে সারা দেশব্যাপী বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই যাত্রার মাধ্যমে গো-সম্পদের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বোঝাতে ভারতের বিভিন্ন গ্রামে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। মাননীয় রাষ্ট্রপতিকেও এ ব্যাপারে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তা সত্ত্বেও গো-মাংস রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই লাভজনক ব্যবসা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের পরোক্ষ মদতে সুপরিকল্পিতভাবে এ ঘটনায় ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে চরম অন্তরায় সৃষ্টি হতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমানে গো-নিধন যজ্ঞের বাড়বাড়ন্তে ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তাই অবিলম্বে গো-হত্যাকারী ও মদতদাতাদের কঠোর শাস্তির জন্য কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করা দরকার। আর প্রশাসনিক স্তরেও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ গো-হত্যা বা পাচারের ঘটনা সর্বদাই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

যীশু ও প্রাচ্যদেশীয় তিন জ্ঞানী

যীশুখৃস্টের অন্যতম চরিত্রকার ম্যাথিউ বলেছেন— যীশু জন্মাবার কয়েকদিন পরই পূর্বদেশ থেকে একদল দৈবজ্ঞ গুণী জেরুসালেমে এসে খোঁজ করছিলেন, ইহুদিদের যিনি রাজা হবেন তিনি কোথায় জন্মেছেন। কলকাতার 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় উদ্ধৃত (তাং ২২.১২.১১) লন্ডনের 'দি টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন সূত্রে ওই সম্পর্কে কিছু নতুন কথা জানা গিয়েছে।

ভ্যাটিক্যানের মহাফেজখানায় ৮ম শতাব্দীর একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি আড়াইশত বৎসরের উপর ওই মহাফেজখানায় মজুত ছিল। তবে কি ভাবে কোথা থেকে সেটি এসেছিল, সে বিষয়ে কিছু জানা নেই। ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক Brent Landau পাণ্ডুলিপিটির পাঠোদ্ধার করে বলেছেন— পাণ্ডুলিপিটি ম্যাথিউ-প্রণীত যীশুচরিতের রচনাকালের পরবর্তী অনধিক একশত বৎসরের মধ্যে লেখা একটি কাহিনীর অনুলিপি। উল্লেখ্য, ম্যাথিউ গস্‌পেলের রচনাকাল ৮০ থেকে ৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময় (দ্রঃ 'যীশুচরিত'— তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়)। অধ্যাপক Landau পাণ্ডুলিপিটির পাঠোদ্ধার করে বলেছেন— পাণ্ডুলিপিটি ম্যাথিউ প্রণীত যীশুচরিতের রচনাকালের পরবর্তী অনধিক একশত বৎসরের মধ্যে লেখা একটি কাহিনীর অনুলিপি। উল্লেখ্য, ম্যাথিউ গস্‌পেলের রচনাকাল ৮০ থেকে ৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনও একসময়— (দ্রঃ 'যীশুচরিত'— তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়)। অধ্যাপক Landau জানিয়েছেন— ম্যাথিউ গস্‌পেলে বর্ণিত জ্ঞানী মেজাই বা (Magi) আদম-এর তৃতীয় পুত্র Seth-এর বংশধর; তাঁরা প্রাচীন চীনের অন্তর্ভুক্ত Shir ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন।

প্রসঙ্গত, আর একটি কথা। গত পূজা সংখ্যা স্বস্তিকায় (০৩.১০.১১) যীশুখৃস্ট ও আজকের খৃস্টধর্ম নিয়ে আলোচনায় 'পূর্বদেশের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি' প্রসঙ্গে ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী বলেছেন যে তাঁরা সম্ভবত নেপাল, তিব্বত বা লাদাখের কোনও প্রয়াত লামার পুনর্জন্মগ্রহণের ইঙ্গিত পেয়ে প্যালেস্টাইনে গিয়ে শিশু যীশুকে ওই লামার জন্মান্তর বলে সনাক্ত করেছিলেন। কিন্তু অতদূর থেকে ভারতের কোনও মঠে নিয়ে আসার পথশ্রম শিশু যীশুর সহ্য হবে না বলে তাঁরা যীশু ও মা মেরীকে আলেকজান্দ্রিয়ার মঠে স্থানান্তরিত করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। ডঃ ব্রহ্মচারীর উক্ত অনুমিতি 'গ্রহণযোগ্য' বলে মনে হয় না। কারণ, পরবর্তীকালে যীশু চৌদ্দ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে এসে জগন্নাথধাম, রাজগৃহ, কাশীধাম প্রভৃতি তীর্থ পরিক্রমার পর বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তুতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সঙ্গে ছয় বৎসরকাল থেকে পালিভাষা শিখে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর, নেপাল এবং হিমালয় পরিভ্রমণ করে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে স্বদেশে ফিরে যান। ওই দীর্ঘ ১২/১৩ বৎসর যাবৎ যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পরেও কোন বৌদ্ধ মঠই যীশুকে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত মঠপ্রধান বা লামা বলে আবাহন করেনি।

পরিশেষে আর একটি কথা। গস্‌পেলে পূর্বদেশাগত জ্ঞানী ব্যক্তিদের 'সংখ্যা' বলা নেই।

সেখানে বলা হয়েছে, ''Some men...came from the east...'' কিন্তু, আমরা পরম্পরাগত ভাবে 'তিনজন' বলে আসছি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক Landau-এর ব্যাখ্যা— ওই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তিন প্রকার অর্ঘ্য শিশু যীশুকে নিবেদন করেছিলেন। সম্ভবত সেই সূত্রে ওই 'তিন' সংখ্যাটি প্রচলিত হয়েছে।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

আশাপূরণ থেকে আশাভঙ্গের কাহিনী

দেবব্রত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের কাণ্ডারী তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মা-মাটি-মানুষের সরকারের কার্যকালের এক বছর পূর্ণ করেছেন। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে "প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি" নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন তিনি গত ২০ মে ২০১২ তারিখে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় রাজ্যের সমস্ত দপ্তরে নব্বই শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, আগামী চার বৎসর শুধু মনিটর করতে হবে। মা-মাটি- মানুষ গদিতে আসীন হওয়ার পর রাজ্যে সন্ত্রাসে গৃহহারা, নিহত, উৎপাদনের দাম না পেয়ে ১ বৎসরে ৫৬ জন চাষীর আত্মহত্যা, যখন- তখন নারী ধর্ষণ, কলেজ-স্কুলে তৃণমূলীদের তাণ্ডব, বেকারি নিরসনে বন্ধ কারখানা খোলা, শিল্পের জন্য জমি নীতি, মূল্যবৃদ্ধির রেশ এবং গ্রামীণ মানুষের বৎসরে ১০০ দিনের কাজের কোনও নির্দিষ্ট হিসাব, সর্বোপরি রাজ্যে বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনও বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়নি। বাংলার মানুষ নতুন এই সরকার থেকে কি পেয়েছেন গত এক বৎসরে— আশাপূরণ থেকে "আশাভঙ্গের কাহিনী", সাফল্য না ব্যর্থতা এসবেরই বিচার বিশ্লেষণ তুঙ্গে।

প্রথমেই আসি শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা ক্ষেত্রে দলতন্ত্রের বদনাম ঘুচিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সরকার রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের প্রতিটিতে যাতে কলেজ করা যায় তার উপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে গুণ্ডামি-নৈরাজ্যবাদ দূর করবে এই সরকার। কিন্তু রায়গঞ্জে অধ্যক্ষকে রাস্তায় টেনে এনে মার, মাঝদিয়ায় অধ্যক্ষকে আটক, ইসলামপুরে অধ্যাপক নিগ্রহ এই সব ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বলা যায় শিক্ষাব্যবস্থায় শান্তি ফিরেছে কী? এবার আসা যাক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়। পুস্তিকায় বলা হয়েছে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে রাজ্য মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত। স্টেট ব্যুরো অফ হেলথ ইনটেলিজেন্স রিপোর্টে জানা যায় মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত রাজ্যে শয্যা আছে ৬৯, ২৫৬টি। তিনি বলেছেন ৩০০০ শয্যা বেড়েছে। তাহলে উপরোক্ত স্টেট ব্যুরো অফ হেলথ ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী শয্যা সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৭২,২৫৬টি, কিন্তু পুস্তিকায় বলা হয়েছে ১ বৎসরে শয্যাসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬২, ৬৪৫টি। তাহলে ঘোষণাটা কি সত্যি?

রাজ্যে শিল্পের হাল হকিক্‌ত জানাতে কূটবুদ্ধির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আর বি আই বুলেটিন অনুযায়ী রাজ্যে বড়শিল্প ২২৯, ছোট শিল্প ৫৬,০৮৩ বন্ধ বা রুগ্ন হয়ে আছে। এই শিল্পগুলি মা-মাটি-মানুষের সরকার নীরব। দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য বি আই এফ আর-এর বিচারাধীন ২৪৩ সংস্থার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে :

২০০৯-১০	২৭টি
২০১০-১১	৩৬টি
২০১১-১২	৪৩টি

এই তিন বৎসরে বি আই এফ আর থেকে বেড়িয়ে এসে পুনরুজ্জীবিত করা গেছে যথাক্রমে ৪, ৫ এবং মা-মাটি সরকারের আমলে ৬ টি। কি বিরাট সাফল্য! হাসি পাচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান দিতে পুস্তিকায় বলা হয়েছে বামরাজত্বে ২০১০-১১ সালে যেখানে ধান উৎপাদন হয়েছিল ১৩৩৮৯.৬১ টন সেখানে ২০১১-১২-তে হয়েছে ১৫০৪৪ টন। ২০১০-১১-তে গম উৎপাদন হয়েছিল ৮৭৪.৪২ টন, মমতার রাজত্বে হয়েছে ৯০৮ টন। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ডাল, তৈলবীজ, পাট, তুলো আখের উৎপাদন। কিন্তু স্বীকার করেননি ধানের সরকারি নির্ধারিত দাম ১০৮০ ও ১১২০ টাকা কিন্তু কোনও চাষী ২০১১-১২ সালে ধানের দাম ৫৬০ টাকা থেকে ৬০০ টাকার বেশি পায়নি। ফলে ধান উৎপাদনের খরচ তুলতে না পেরে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৫৬ জন চাষী আত্মহত্যা করেছে। পুস্তিকার আবাসন প্রকল্পে বলা হয়েছে ২০১১-১২ সালে বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৬০০ কোটি টাকা, কিন্তু খরচ করা হয়েছে ১৪৬.৬৩ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ২৪.৪৪ শতাংশ মাত্র।

রাজারহাটে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী শ্রী গৌতম দেব বেআইনি ভাবে চাষীদের জমি কমদামে কিনে বেশি দামে 'প্লট প্লট' করে "হিডকোর" মাধ্যমে বিলি করেছেন। কিন্তু সেই জমি মা-মাটি-মানুষের সরকারও বিলি করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার ২০০৯-১০ বিলি করেছে ৩০৯ টি, বামফ্রন্ট সরকার ২০১০-১১ বিলি করেছে ৪৩০ টি, আর 'মা-মাটি-মানুষে'র সরকার বিলি করেছে ৫২৮টি।

দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের থেকে জানা যায়— একটি মানুষের দৈনিক খাদ্য দরকার ২৪০০ ক্যালোরি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষ কম দেখানোর উদ্দেশে বলেছিল, মানুষ প্রতি ২১০০ ক্যালোরি হলেই চলে যায়। এই পদ্ধতিতে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ২৬ শতাংশ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নীচে দেখায় আসলে রাজ্যে তখন দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৪৬ শতাংশ। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দাবি করেছে জনপ্রতি ২৭০০ ক্যালোরির জোগাড় করে দিতে পেরেছেন। তা হলে রাজ্যে তো কোনও মানুষেরই আর দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা উচিত নয়! পুস্তিকায় বলা হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হতে হবে ১ : ৪০ যা এ রাজ্যে অনেক কম ছিল। এ সমস্যা লক্ষ্য করে নতুন সরকার প্রাথমিকে ৫৪৪৫টি, উচ্চমাধ্যমিকে ৩৯,৫১০টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করেছে, এই পদগুলি পূরণ করবেন স্কুল সার্ভিস কমিশন, কিন্তু এখনও কোনও শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। স্বরাষ্ট্র দফতরের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন রাজ্যে হিংসা প্রতিহিংসা বা হানাহানির তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। কার্টুন কাণ্ডে অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র গ্রেপ্তার হলেন, যাদবপুরে সাংবাদিক নিগ্রহ, মিছিলে তৃণমূল সমর্থক কনস্টেবল তারকবাবুর ভূমিকা এসব কী শান্তি স্থাপনের প্রয়াস?

৩৪ বৎসরের বাম অপশাসনের থেকে মুক্তি ও পরিবর্তনের স্লোগান বাস্তবায়িত করাই মমতা সরকারের লক্ষ্য ছিল। দলতন্ত্রকে বিনাশ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন বলেছিলেন মা-মাটি-মানুষের সরকার সেই নিরিখে এই দলকে ৯০ শতাংশ মার্কস দেওয়া যায় কি? পরিশেষে বলতে বাধ্য হচ্ছি বেকার সমস্যা সমাধানের রাস্তা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৩ এপ্রিল দুর্গাপুরে বলেই দিয়েছেন যুবকদের—চাকরীর আশায় না থেকে তারা যেন নিজেরাই কাজ খুঁজে নেয়। এরই নাম মা-মাটি-মানুষের সাফল্যের খতিয়ান!

পৌরাণিক চরিত্র

সূর্যপুত্র মহাবীর কর্ণ

প্রিয়াংশু বিকাশ ভট্টাচার্য

যদুশ্রেষ্ঠ শূর বাসুদেবের পিতা ছিলেন। তাঁর কন্যার নাম পৃথা। তিনি রূপে এই পৃথিবীতে অতুলনীয়া ছিলেন। নিজের পিসতুত ভাই নিঃসন্তান কুন্তীভোজকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রথম সন্তান তাঁকে দান করবেন। পৃথা পিতার গৃহে অবস্থানকালে দেবতা ও অতিথি পূজায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে দুর্বাসা অতিথিরূপে এলে পিতার নির্দেশে দুর্বাসার পরিচর্যা আরম্ভ করলেন। জিতেন্দ্রিয় কঠোর ব্রতপালনকারী ও ধর্ম্মজ্ঞ উগ্রতপস্বী দুর্বাসাকে কুন্তী সর্বপ্রকার সেবা করে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সবদিক বিবেচনা করে এবং আগামীদিনের সংকটের কথা বিবেচনা করে দুর্বাসা কুন্তীকে বশীকরণ মন্ত্র ও তার প্রয়োগশিক্ষা প্রদান করলেন। যে যে দেবতাকে তুমি মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করবে তার প্রভাবে তোমার পুত্র হবে। ''তস্য তস্য প্রভাবেন পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।।'' সেই মন্ত্র পেয়ে তার শক্তিপরীক্ষা করার জন্যে কুন্তী কৌতূহলবশত সূর্যদেবকে আহ্বান করলেন। সূর্য উপস্থিত হয়ে বললেন, ''হে কল্যাণী, তোমার কি কার্য সম্পাদন করব বল।'' পৃথা বললেন, ''হে শত্রুদমন, হে বিভো, আমাকে ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণের দেওয়া মন্ত্র পরীক্ষার জন্যে আমি এ কাজ করেছি।'' আমার আগমন বৃথা হতে পারে না, আমার আগমনের ফলে তোমার যে পুত্র জন্ম নেবে সে মহাবীর, কবচকুণ্ডলধারী হবে। সে শস্ত্রের অবধ্য হবে। সে দাতা হবে। ব্রাহ্মণকে অদেয় কিছুই থাকবে না। আমার কৃপায় তোমার কুমারীত্ব নষ্ট হবে না। কর্ণের জন্ম হলে লোকলজ্জার ভয়ে কুন্তী ধাত্রীর সাহায্যে বলিষ্ঠ শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিলেন।

''উৎসসর্জ কুমারং ত্বং জলে কুন্তী মহাবলম্।।''

এই শিশুকে পেলেন স্নানরতা রাধা ও তার স্বামী অধিরথ। অধিরথ পেশায় সারথি। শিশুকাল থেকেই কর্ণ সূর্যের উপাসনা করতেন। ব্রাহ্মণদের অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের কবচ কুণ্ডল নিয়ে গেলে পরিবর্তে একাঘ্নী শক্তি দান করলেন। যে শক্তি দ্বারা কর্ণ একজনকে বধ করতে সমর্থ। রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে অর্জুন কৃত্রিম যুদ্ধের কলাকৌশল প্রদর্শন করলেন। সব কলাকৌশল কর্ণও প্রদর্শন করলেন। কর্ণ অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। রাজার ছেলে না হলে রাজার ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না একথা বলে কৃপাচার্য যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করলেন। কর্ণ পিতা অধিরথকে প্রণাম করলে ভীম উপহাস করলেন। ''শরণাঞ্চ, নদীনাঞ্চ দুর্বিদাঃ প্রভবাং কিল'' বললেন দুর্যোধন, ''বীর ও নদীর উৎপত্তি স্থান খুব দুর্জ্ঞেয়। দ্রোণাচার্যকে গুরু দক্ষিণা স্বরূপ রাজা দ্রুপদকে বন্দী করতে ব্যর্থ হলো কর্ণ। কিন্তু অর্জুন ও ভীম তাকে বন্দী করতে পেরেছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কর্ণ উপস্থিত হলে দ্রৌপদী বলেছিল ''নাহং বরয়ামি সূতম''। সূতপুত্রকে বরণ করব না। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের ব্রহ্মতেজ দেখে কর্ণ যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান।

দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞে কর্ণ বহু রাজ্য জয় করেছিলেন। বিরাট রাজ্যের গোধন হরণের সময় কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে পরাজিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু কর্ণ রাজি হয়নি। এই অবস্থাতে দুর্যোধনের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করতে পারি না--- বলেছিলেন কর্ণ। ''নেতা যস্য হৃষিকেশ : যোদ্ধা ধনঞ্জয়।'' নেতা যার শ্রীকৃষ্ণ এবং যোদ্ধা ধনঞ্জয় যেখানে আছেন তারা জিতবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য কৃতবর্মা শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি বেঁচে থাকবে। কুন্তীর কাছে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন— অর্জুন ছাড়া আর কাউকেই হত্যা করবেন না। যুদ্ধের সময় জানলেন পঞ্চপাণ্ডব তাঁর ভ্রাতা। পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় কর্ণ দেখা করতে এলেন। ভীষ্ম বললেন, ''বাণক্ষেপণে দিব্যাস্ত্রসমূহের সন্ধানে। হস্তের নৈপুণ্য প্রদর্শনে, অস্ত্রবলে তুমি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে দাও। গঙ্গাপুত্রকে প্রণাম করে কর্ণ চলে গেলেন দুর্যোধনের কাছে। কর্ণ অর্জুনের জন্যে রক্ষিত একাঘ্নী বাণ দিয়ে ঘটোৎকচকে হত্যা করল। সাধারণ একজন যোদ্ধা ঘটোৎকচ। শ্রীকৃষ্ণ খুব আনন্দিত হলেন। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নষ্টকারী আজ আর বেঁচে নেই। একলব্য দিবারাত্র যুদ্ধ করতে পারত। তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি দ্রোণাচার্য কেটে নেন। তাই সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কুরুক্ষেত্র মহাসমর প্রাঙ্গণে দ্রোণ নিপতিত হয়েছেন। এবার দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্ণকে সেনাপতি করার কথা বললেন। এতদিন অর্জুন ও কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে আসতে সাহস পেতেন না। ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে কর্ণ সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হলেন। ব্রাহ্মণদের স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন কর্ণ। কর্ণের সারথি হলেন মদ্ররাজ শল্য। শল্যকে কর্ণ বললেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কখনও যুদ্ধে পরাজিত হয়নি। আজ আমি এদের পরাজিত করব! কর্ণকে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর সময়ে ব্রহ্মাস্ত্রের কথা স্মরণে আসবে না। আর সব সময় ব্রহ্মাস্ত্র স্মরণে থাকবে। হে শল্য আমি আজ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু অথবা জয়লাভের জন্যে যুদ্ধ করব।

হে শল্য আমি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎসকে বধ করেছিলাম। ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি ভয়প্রাপ্ত হবে এবং তোমার রথচক্র মেদিনীতে গ্রাস করবে। এই ব্রাহ্মণকে হাজার ধেনু দিতে চেয়েছিলাম। আমি তাকে বৎসযুক্ত চৌদ্দ হাজার গাভী দিয়েছিলাম। তথাপি তার কৃপা পাইনি। কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সর্পসুখবান নিক্ষেপ করলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ পায়ের চাপে রথ মেদিনীতে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। অর্জুনের শুধু কিরীট ধ্বংস হলো। এই সর্পবাণ আবার কর্ণের তূণে ফিরে এলেও কর্ণ দ্বিতীয়বার তাকে ব্যবহার করলেন না। হে নাগ, অন্যের উপর নির্ভর করে আমি যুদ্ধ করি না, বললেন কর্ণ। তূণে সর্পসুখবাণ আরও আছে। রথচক্র মেদিনীতে গ্রাস করলো। কর্ণ অর্জুনের কাছে সময় চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কৌরব সভায় দ্রৌপদীকে অপমান করেছিলে। কর্ণ অর্জুনের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। নিরস্ত্র অবস্থাতে কর্ণ অর্জুনের বাণে নিহত হলো। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অর্জুনকে বললেন, ''তুমি আমি কুন্তী ধরণী পরশুরাম এবং ইন্দ্র এরা সবাই মিলে কর্ণকে হত্যা করেছে।''

অধ্যাত্ম রামায়ণ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার সদর শহরসিধিতে স্থাপিত অধ্যাত্ম রামায়ণ মন্দিরে অখণ্ড ১০৮ রামনাম সংকীর্তন বহু বছর যাবৎ চলে আসছে। এ হলো সেই পবিত্র স্থান সেখানে একদা জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'কাদম্বরী' গ্রন্থ রচয়িতা বাণভট্ট এবং প্রতিভাবান সভাসদ বীরবল। সিধি জেলার সোনবর্ষা গ্রামে ১৯৮০ বিক্রম সংবতে (১৯২৩ খৃস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে স্বনামধন্য সন্ত মহাত্মা গোপাল দাস মহারাজ। কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি অনেক অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখিয়েছেন তাঁর জীবিতাবস্থায়। ফলে সিধি এবং আশপাশের বিভিন্ন জেলায় তাঁর কীর্তিকলাপ ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তাঁর ভক্ত সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং খ্যাতি দূর-দূরান্তে পৌঁছায়। ১৯৬২-তে তিনি সিধিতে মণিকূট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু হয় জয়রাম শ্রীরাম, জয় জয় রাম— অখণ্ড সংকীর্তন। যা তাঁর দেহাবসানের পরও অবিরাম চলে আসছে। বর্তমানে মণিকূট আশ্রম চত্বরেই তৈরি হয়েছে সুন্দর অধ্যাত্ম রামায়ণ মন্দির, তপোবন কুটীর, সৎসঙ্গ মন্দির এবং শ্রীরাম-জানকী মন্দির। ১১ মে, ১৯৮৭-তে অধ্যাত্ম রামায়ণ মন্দিরের শিলান্যাস হয়। সন্ত গোপালদাসজী মহারাজের অগাধ পরিশ্রমের ফলে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০০-এ মন্দির সম্পূর্ণ হয়। মন্দিরে রাম-জানকী, শিব-পার্বতী মহারাজের গুরুদেবের মূর্তি রয়েছে। মন্দিরটি শ্রদ্ধাবান জনসাধারণকে মহারাজ উৎসর্গ করে দেন। এলাকার মানুষ অধ্যাত্ম মন্দিরকে তাদের গর্বের প্রতীক বলে মনে করেন। সিধি শহরের মাঝখানে উঁচু পাহাড়ি টিলার উপরে স্থাপিত হয়েছে ওই মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহের দেওয়ালে জয়পুরের দক্ষ কারিগরেরা শ্বেতপাথরের উপরে খোদাই করে লিখেছে রামায়ণ-কাহিনী। একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ ও হনুমানজীর মন্দির। রয়েছে আকর্ষক ও সুন্দর মূর্তি যা শ্রদ্ধালু ভক্তজনকে আকৃষ্ট করে চলেছে।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ১০

রামজীবনপুরের মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

লক্ষ্মীজনার্দনের 'আটচালা', বাবুরামপুর বাজার, রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা)

পূর্বোক্ত জাড়া থেকে শ্রীনগর হয়ে ক্ষীরপাই- আরামবাগ পাকা রাস্তা রামজীবনপুরের ওপর দিয়ে হুগলি জেলায় প্রবেশ করেছে। রামজীবনপুর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রান্তসীমায় অবস্থিত। ক্ষীরপাই থেকে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে। এটি একটি পৌর শহর। স্থানটি বেশ প্রাচীন। রেনেল ও অন্যদের অঙ্কিত মানচিত্রে এই স্থান 'Ramjabenpur' নামাঙ্কিত। আঠার-উনিশ শতকে এই স্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধি হয়ে উঠেছিল। এখানে সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক সম্প্রদায় ও অন্যান্য বণিক সম্প্রদায় ছিল বিত্তশালী। পিতল-কাঁসা, তাঁতের ব্যবসায়ে তারা খুবই ধনী হয়ে ওঠে। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় উৎপন্ন দ্রব্য বাইরে রপ্তানি করা সহজসাধ্য ছিল। এই সব বিত্তবান ব্যক্তি রামজীবনপুরে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের দুর্গাদালানে ঘটা করে দুর্গোৎসবও হোত। এখনও কিছু কিছু হয়।

রামজীবনপুরে বহু মন্দিরের মধ্যে কয়েকটি বেশ উল্লেখযোগ্য। এখানের সর্বপ্রাচীন মন্দির কোন্‌টি, এখন বলা কঠিন। তবে কারও কারও মতে 'পুরাতনহাটে' পার্বতীনাথ শিবের 'আটচালা'-রীতির মন্দিরকে সর্বপ্রাচীন মন্দির মনে করা হয়। জানা যায়, এটি ১৭২৩ থেকে ১৭২৪ শকাব্দের (১৮০১-১৮০২ খ্রিঃ) মধ্যে নির্মিত হয়। মন্দিরে এখন কোনও লিপি নেই। 'বাবুরামপুর বাজারে' বাঁকা রায়ের 'আটচালা' ১২২৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয় (১৮২০ খ্রিঃ)। এর দেওয়ালে অনেক 'টেরাকোটা' মূর্তি ছিল। এখন আর নেই। কে বা কারা অনেকদিন আগে সেগুলি খুলে নিয়ে গেছে। লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হলো :

'শ্রীশ্রীবঙ্কুবেহারি জিউ/ইশ্বর মন্দির/সকাব্দা। ১৭ স ৪২/সন ১২ স ২৭ সাল/শ্রীরামসদয় মহাম/গুল মিশ্রি/লক্ষীনারায়ণ মিশ্রি'।

লিপি থেকে জানা যায় রামসদয় মহামগুল মিস্ত্রি মামে এক ব্যক্তি এটির প্রতিষ্ঠাতা ও লক্ষ্মীনারায়ণ মিস্ত্রি এর স্থপতি ছিলেন।

রামজীবনপুরে অনেক মন্দিরের মধ্যে কয়েকটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আছে। এর মধ্যে 'পিরিপাড়ায়' পিরিদের দামোদরের' পঞ্চরত্ন' ও শ্রীধরলাল জীউ-এর 'পঞ্চরত্নে' 'টেরাকোটা' লক্ষ্য করা যায়। শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' ১২৩৮ সালে নির্মিত (১৮৩১ খ্রিঃ)। প্রামাণিকদের দামোদরের 'পঞ্চরত্নে' যে লিপি আছে, তা থেকে জানা যায়, মন্দিরটি রামজীবনপুরেরই এক মিস্ত্রি তৈরি করেন। লিপিটি এখানে (সারি ও বানান অনুসারে যথাযথ) উদ্ধার করা হলো :

'৭ শ্রীশ্রী দামোদর ঠাকুর জিউ/৭ শ্রীশ্রী লক্ষিনারায়ণ জিউ/সকাব্দা ১৭৬২। সন ১২৪৭ সাল/তারিখ ১৩ জাস্ট/শ্রীবংসীধর দাস/প্রামাণিক/মিস্ত্রী শ্রী/পেলারাম ষূত্রধর সাং রা/মজীবনপুর'।

এর থেকে জানা যাচ্ছে, রামজীবনপুরে মন্দিরমিস্ত্রি সূত্রধরদের বসতি ছিল। স্থানে স্থানে এইসব সূত্রধর বাস করতেন।

রামজীবনপুরের 'দত্তপাড়ায়' দামোদরের 'পঞ্চরত্নে' কয়েকটি টেরাকোটা আছে। 'কায়স্থপাড়ায়' সিংহদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'চাঁদনি'তে পোড়ামাটির প্রচুর মূর্তি আছে। টেরাকোটার মধ্যে গৌর-নিতাই ও অদ্বৈতাচার্যের মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পৌরাণিক ও কৃষ্ণলীলা দৃশ্যও আছে। এই মন্দিরে কাঠের দরজার কারুকার্যও খুব প্রশংসনীয়। ১২২১ বঙ্গাব্দে (১৮১৪ খ্রিঃ) শিবচরণ দাস ব্রজবাসী এই সুন্দর 'চাঁদনি'-রীতির মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'বামুনপাড়ায়' চাটুজ্যেদের 'নবরত্ন' মন্দিরটি ১২২৯ বঙ্গাব্দে (১৮২২ খ্রিঃ) নির্মিত। 'নতুনহাটে' দাসেদের 'পঞ্চরত্নটির লিপি থেকে জানা যায়, সেটি ১২১৫ সালে (১৮০৮ খ্রিঃ) নির্মিত হয়। রামজীবনপুরে আরও অনেক মন্দির লক্ষ্য করা যায়।

মন্দিরবহুল এই স্থান কতকটা চন্দ্রকোণার সঙ্গে তুলনীয়। চৈতন্যপরবর্তী যুগের প্রায় সব শৈলীর মন্দির দেবালয় আঠার-উনিশ শতকের মধ্যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধ জনপদ রামজীবনপুর সেকালে বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রেনেল ও তাঁর সহযোগীদের অঙ্কিত মানচিত্রে (১৭৬৭-৭৪ খ্রিঃ) এটিকে একটি সমৃদ্ধ স্থানরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অন্যভাষার গল্প

মস্তবড় মিথ্যের আলোয়

কুশল দেখল বাবা উর্দি পরে কাজে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। চুপচাপ ঘরে ঢুকল।

'কি ব্যাপার? বাবা জিগ্যেস করল।

'আমার পরীক্ষার ফিজ পড়ে গেছে,' কুশল আস্তে আস্তে বলল।

'কি! টাকা ফেলো দিয়েছো?' বাবা বলল একটু ব্যঙ্গের সুরে।

'আমি পকেটে রেখেছিলাম, যখন ফিজ জমা দেওয়ার জন্যে পকেটে হাত দিলাম তখন দেখি টাকা নেই।' কুশল বলল।

'এত বড় হয়েছো, টাকা পয়সা সাবধানে রাখতে পারো না!' বাবা এবার বলল একটু রাগের স্বরে।

কুশল অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'যাও তোমার মায়ের কাছে গিয়ে পয়সা নাও।'

কুশলের চিন্তা কিছুটা কাটল। গতকালই মাকে বলেছিল ফিজের টাকা পড়ে গেছে। বাবাকেও বলেছে। কুশল জানে, বাবা বললে মা তাকে টাকা দিয়ে দেবে। ওর বাবা শুধু বাইরে পুলিসওয়ালা নয়, ঘরেও একই মেজাজ। সামান্য ভুলের জন্যে চেঁচানো আর মারধর করা বাবার কাছে সাধারণ ব্যাপার। মা-ও ভয় পায় বাবাকে। কুশল মায়ের কাছে টাকা নিয়ে স্কুলে চলে গেলো। আজ সে মিথ্যে বলেছে। কিন্তু সেজন্যে কোনও দুঃখ নেই তার।

২.

ওই দিন কুশল দোকান থেকে পত্রিকা কিনে বাড়ি ফিরছিল, তখন দেখল অন্যদিক দিয়ে যাচ্ছে বিকাশ। তার জামাপ্যান্ট বেশ ময়লা, চুলে মাটি লেগে আছে। বিকাশের ওই অবস্থা দেখে অবাক হলো কুশল। একই ক্লাসে দুজনে পড়ে। তবে বিকাশের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নেই। সে জানে বিকাশ গরীব ঘরের ছেলে। ওর বাবা রাস্তায় ফল আনাজ বিক্রি করে। সে দেখেছে বিকাশও খুব কম ছেলের সঙ্গে কথা বলে। তবে পড়াশোনায় বেশ ভালো। কিছুদিন হলো সে স্কুলে যাচ্ছে না।

'আরে বিকাশ, তোমার এরকম অবস্থা কেন?' সামনে এগিয়ে গিয়ে বিকাশকে থামিয়ে জিগ্যেস করল কুশল।

'আমি অন্যের মজুর খাটতে যাচ্ছি।' বিকাশ বলল। 'তোমার বাবা কোথায়?' কুশল জিগ্যেস করল। 'ওঁর তো দোকান ছিল, কি হলো?' কুশল আরও জানতে চাইল।

'একদিন তোমার বাবা ফল নিয়েছিল আর আমার বাবা পয়সা চাইতে তোমার বাবা রেগে গিয়ে আমার বাবাকে খুব মারে। শুধু তাই নয় সমস্ত ফল নালায় ফেলে দেয়। আমার বাবা কয়েকদিন হাসপাতালে ছিল। তার চিকিৎসায় আমাদের সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেছে। ঘরে খাওয়ার পয়সা যখন নেই তখন ফিজ কোথা থেকে জমা দেবো? সেজন্যে স্কুল ছেড়ে দিয়েছি।' বিকাশ বলল।

বিকাশের কথা শুনে কষ্ট হলো কুশলের। তার বাবার জন্যে বিকাশের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! সে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলো বিকাশকে সাহায্য করবে।

'তুমি স্কুলে এসো। আমি তোমার ফিজের টাকা দেবো। আমার বাবার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবো।' কুশল বলল।

সে বিকাশকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিল। মাখুরাম অরোরার দোকানে ওর জানাশোনা। তারা চাইছিল একটা কাগজ আর পত্রিকা বিক্রির জন্যে ছেলে। কুশল জানত পরীক্ষার ফিজ এসময়ে জমা দেওয়া বিকাশের পক্ষে অসম্ভব। সেজন্যে যে টাকা নিজের ফিজ জমা দেওয়ার জন্যে নিয়ে এসেছিল তা জমা করল বিকাশের নামে।

৩.

সন্ধ্যেবেলা কুশল বাড়িতে ফিরে দেখল বাবা ঘরে।

'কুশল এখানে এসো।' তাকে দেখতে পেয়ে বাবা ডাকল।

কুশলের মনে হলো, আজ তার বাবা একটু বেশি রেগে আছে।

'আচ্ছা, তুমি বলেছিলে টাকা পড়ে গেছে। আমি পুলিশের লোক। আমি জেনেছি, তুমি ওই টাকা বিকাশ নামে ছেলেটার ফিজ হিসেবে জমা দিয়েছো। সেই ছেলেটার কাছ থেকে তুমি টাকা ধার নিয়েছিলে, না তাকে ধার দিয়েছিলে?' বাবা বেশ রেগে বলল।

'ওই টাকা কি করেছিস?' মা জিগ্যেস করল।

'উত্তর দিচ্ছো না কেন?' বাবা কঠোরভাবে বলল।

'আমি টাকা ধার নিইনি, ধার দিইনি। আমি তোমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।' কুশল বলল।

'আমার অন্যায়?'

'হ্যাঁ, তুমি বিকাশের বাবাকে মেরেছিলে সে তোমাকে বিনা পয়সায় ফল দিতে চায়নি বলে। যার ফলে তাদের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার জন্যে বিকাশের পড়া বন্ধ হয়েছে। কারণ, ঘরের সব টাকা তার বাবার চিকিৎসায় শেষ হয়েছে। আমি চাইনি তোমার জন্যে তার জীবন নষ্ট হয়ে যাক। এজন্যে আমি তার ফিজ জমা দিয়েছি। নিজের জমানো টাকাও ওকে দিয়েছি।' কুশল বলল।

বাবা ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা যাও। মাইনে পেলে আমার কাছ থেকে দু হাজার টাকা নিয়ে ওর বাবাকে দিয়ে আসবে আবার কাজ শুরু করার জন্যে।'

কুশল বাবার দিকে তাকাল। তারপর বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

পুনর্কথন : কৌশিক গুহ

জন্মদিনের শুভেচ্ছাপত্র

জন্মদিন আসে বার বার

কোন্ ধরনের বই কার ভালো লাগে? কে কি পড়তে চায়? এমন দুটো প্রশ্ন অজয়-স্যার প্রায়ই করেন। তাঁর কাছে সব ছেলের নামে কার্ড আছে। কি কি লেখা আছে তাতে? ঘর কেটে কেটে ভাগ করে লেখা অনেক কিছু। নাম, ঠিকানা, বয়স, জন্ম তারিখ বছর, পছন্দের খাবার, পছন্দের বই, পছন্দের মানুষ, এইরকম বড় তালিকা রয়েছে। ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত আটটা ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রের নাম জানেন। জন্মদিনে একটা কার্ড পায় সবাই। তাতে লেখা থাকে, 'অমুক তারিখে তোমার জন্মদিন। খুব খুশির দিন। আমাদের স্কুলের ছাত্র তুমি। এমন দিনে তোমাকে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে স্কুলের পক্ষ থেকে। আনন্দে থাকো। সবকিছুতে বড়ো হও।' চিঠি পেয়ে খুশি হয় সকলে। নিজে হাতে কার্ড তৈরি করে দেন অজয়-স্যার। অনেকের বাড়িতে প্রতি বছরের কার্ড যত্নে রাখা আছে। কথাগুলো প্রতি বছর প্রায় একরকম থাকলেও ছবি একটু বদলে যায়। অজয়-স্যার যখন যেমন খুশি আঁকেন। স্কুলের কোনও কোনও শিক্ষক পরামর্শ দেন, 'কেন এত খাটেন? কার্ড ছেপে নিলেই পারেন।' অজয়-স্যার জবাব দেন, 'ছেলেদের জন্যে একটু কাজ করাকে খাটা বললে আমি সেই পরিশ্রমে সবসময় তৈরি।' অনেককে বই উপহার দেন বিভিন্ন সময়ে। জন্মদিনে কোনও কোনও ছাত্র নেমন্তন্ন করতে চায়। রাজি হন না। জন্মদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ নয় তাঁর। কারণ স্কুলের সব ছাত্রের পারিবারিক অবস্থা একরকম নয়। তাঁর তৈরি জন্মদিনের শুভেচ্ছাপত্র একইরকমভাবে পৌঁছে যায় সব ছাত্রের কাছে। খুশি ছড়িয়ে পড়ে। এটাই তিনি মনে করেন মস্তবড় পাওয়া।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. সুকুমার রায়ের মৃত্যু কত বছর বয়সে? প্রথম বই-এর নাম? মৃত্যুর আগে, না পরে বেরিয়েছিল?

২. রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের দুটি নাম নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর নিজের ছেলেমেয়ের ডাক নাম দিয়েছিলেন। কি নাম? তাঁদের আসল নাম?

৩. 'বিশ্বভারতী'তে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ কাকে সঙ্গীতভবন-এর দায়িত্ব দেন?

৪. 'হলদে পাখির পালক' বইটি কার লেখা?

৫. কোন্ লেখকের লেখার তারিফ করায় রবীন্দ্রনাথের উপর বেশ অসন্তুষ্ট হন এক বিজ্ঞানী। লেখকের নাম? বিজ্ঞানীর নাম?

উত্তর : ১. ৩৬ বছর। আবোল তাবোল। মৃত্যুর ৯-দিন পরে। ২. হাসি। তাতা। সুখলতা রাও। সুকুমার রায়। ৩. শৈলজারঞ্জন মজুমদার। ৪. লীলা মজুমদার। ৫. রাজশেখর বসু। প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ছোটোদের বলছি

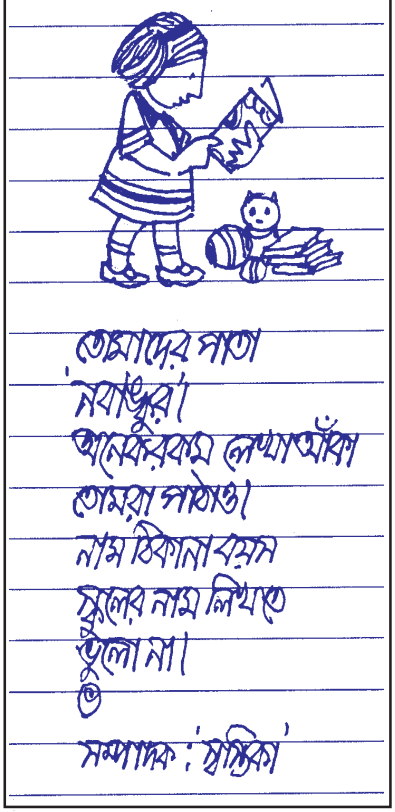

তোমাদের পাতা 'নবাঙ্কুর'। অনেকরকম লেখা আঁকা তোমরা পাঠাও। নাম ঠিকানা বয়স স্কুলের নাম লিখতে ভুলো না।

ও

সম্পাদক : 'স্বস্তিকা'

উলটো পালটা

অনেক বছর ধরে মেঘরাজ মণ্ডল কলকাতায় টানা রিকশো চালায়। তার বাবাও এক সময় চালাত। বাবা বলত, 'আমরা খুব গরিব। এক বাঙালি বাবুর বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন থাকি। ছাপরা দ্বারভাঙা ভাগলপুরে বাড়ি।' রিকশোর মালিক বাবুরাম সিং। মিথিলায় বাড়ি। কলকাতা পুলিশে সিপাই-এর কাজ করে। তার নীতি আছে একটা, কলকাতায় চাকরি করতে এসেছো— মনে রাখবে মাইনের টাকায় হাত পড়লে চলবে না। সে টাকার সঙ্গে আরও কিছু যোগ হয়ে গ্রামে যাবে। তাতে ঘরদোর পাকা হবে, জমিজায়গা কিনতে হবে। এখানে পুলিশওয়ালার অনেক সুবিধে। চাকরির পাশাপাশি অনেক কাজ করতে অসুবিধে নেই। বাবুরামের চেনাশোনা কেউ একটা কাজ করে না। মেঘরাজ মণ্ডল সকালে রিকশো টানে। যুধিষ্ঠির যাদবের খাটালের দুধ দেয় বাড়ি বাড়ি বিকেলে। চেহারাটা শক্তপোক্ত। সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তে পারে। রাতে তার রামায়ণ পাঠ শোনে দেশোয়ালি ভাইরা। রামায়ণ পড়ে শোনায় বলে তাকে কোনওদিন রান্না করতে হয় না। মেঘরাজ দুচোখে দেখতে পারে না পুলিশওয়ালা পত্রকার রাজনীতিওয়ালা আর কোর্টবাবু মানে উকিলদের। নিজের রিকশো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। কোনও যুবক রিকশো চড়তে চাইলে রাগ চেপে বলে, 'অন্যকে বলো। আমি যাবো না।' খুব মোটা আর পয়সাওয়ালা লোকদের রিকশোয় নেয় না। ছোটো ছেলেমেয়ে, বউ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের যত্ন করে নিয়ে যায়। পাড়ার লোক তাকে পছন্দ করে। কেউ অসুস্থ হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মেঘরাজ সঙ্গে সঙ্গে রাজি। অনেক গুণ আছে তার। তবে খারাপ দিক একটাই, কখনও-সখনও রেগে যায়। যার উপর রাগে তাকে কোনওদিনও সওয়ারি নেবে না। মেঘরাজ একটু-আধটু ইংরেজি বোঝে। সেদিন দুজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী লোক জিজ্ঞেস করলেন 'ভাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবে আমাদের?' মেঘরাজ চটে বলল, 'ক্যা বোলতা? কেয়া বিশওয়াবিদ্যালয় বোলতা? কাঁহা যানা ঠিকসে বতাইয়ে।' একজন বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'ইউনিভার্সিটি যাবে?' মেঘরাজ বলল সঙ্গে সঙ্গে, 'হাঁ, ঠিকসে বতাইয়েগাতো। কেয়া, উলটাসিধা বিশওয়াবিদ্যালয় বোলতা, ঠিকসে বোলে গা তো ইউনিভার্সিটি। চড়িয়ে। আভি লে যাতা।'

রামগরুড় সংকলিত

শতবর্ষে অনালোচিত বেগম সুফিয়া কামাল

অঙ্গনা

মিতা রায়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের হোমানলে যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন, বিশেষত যে সব মহিলা, তাঁদের অনেকেরই শতবর্ষ পেরিয়ে গেল নীরবে; কেউ কেউ হয়তো সংবাদের শিরোনামে এসেছেন। তবে তাঁরা নেহাতই ব্যতিক্রম। এমনই এক স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় নির্ভীক নারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মহিলা বেগম সুফিয়া কামালের শতবর্ষ এই বছরে। সুফিয়া কামাল পরবর্তী নারীদের কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শ। তাঁর প্রতিবাদী চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, স্নেহশীলা জননীর মানসিকতা নারী সমাজের কাছে অনুসরণীয়। সাধারণ আর পাঁচজনের মতো তাঁর শৈশব কাটেনি। অভিজাত নবাব পরিবারে সুফিয়া কামালের জন্ম এবং ঐশ্বর্য বৈভবের মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা। ১৯১১-র ২০ জুন তাঁর জন্ম। অবিভক্ত পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বত্র তখন আগুন জ্বলছে। সেই পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তাঁর মধ্যে বিস্তারিত হয়। সেই কারণেই নবাব দুহিতা হওয়া সত্ত্বেও মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সামিল। দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। বরিশালের নবাব পরিবারের এই তনয়া বরিশালের অন্যতম প্রাণপুরুষ বিপ্লবী অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে দানাবাঁধা ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিসপত্রের ব্যবহার বয়কট আন্দোলনে, চরকায় সুতো কাটার আহ্বানে সাড়া দেন সুফিয়া। আভিজাত্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে উঁচুতলা থেকে নেমে এসে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং মহিলাদের এ কাজে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। তাঁর এই সাংগঠনিক কাজের প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হতে পারেন প্রতিবাদী; কিন্তু নিজের ধর্মীয় কঠোর বাতাবরণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন চক্ষুশূল। তাতেও তিনি দমে না থেকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোয় তিনি নিরলসভাবে এগিয়ে চলেন। শুধুমাত্র স্বদেশী আন্দোলনে নয়; সাহিত্য, শিক্ষা সমাজসেবা

বেগম সুফিয়া কামাল

এমনকী পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। সে যুগে বিশেষত মুসলিম সমাজে মেয়েদের বিবাহ ছিল বাধ্যতামূলক একটা ব্যাপার। তো সেই নিয়মেই অনায়াসে সুফিয়া কামাল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন সৈয়দ নেহাম হোসেনের সঙ্গে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো তাঁর কর্মজীবনে একটা বিরাট আঘাত নেমে আসে স্বামীর মৃত্যুতে। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না সুফিয়া। মানসিক দিক থেকে সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেও আবার নতুন উদ্যমে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে কলকাতায় চলে আসেন। জীবনের একাকিত্বকে ভোলবার জন্য পরিবারের পরামর্শে ও সমর্থনে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সে যুগে বিশেষত মুসলিম সমাজে তাঁর এই সাহসিকতা সত্যিই এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। সে সময়কার আন্দোলনকারী মহিলাদের সান্নিধ্যে আসেন সুফিয়া কামাল। তাঁদের অনুপ্রেরণায় তিনি যুদ্ধ ও দাঙ্গায় আক্রান্তদের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। সংসার করলেও সমাজ সংস্কারের কাজেও নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। বিপ্লবী লীলা রায়ের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং যৌথভাবে শান্তি কমিটি গড়ে তুলেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে মহিলা সমিতির তিনি ছিলেন সভানেত্রী। ১৯৪৮-এর ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার করনেশন পার্কে পুলিশের লাঠি চালানোর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। শুধু স্বদেশী আন্দোলনে নয়, 'আ মরি বাংলাভাষা'র পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাড়ির মহিলাদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নিরলস কর্মী হিসেবে পরিশ্রম করে কখনও ক্লান্ত বোধ করেননি। সুফিয়া কামালের সাংগঠনিক দক্ষতাও ছিল অপরিসীম। তাঁর নেতৃত্বে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

আমরা বেগম রোকেয়ার কথা জানি। তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন সুফিয়া। বেগম রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবনত সুফিয়া ১৯৪৬-এ দাঙ্গায় আজও শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় খোলেন, নাম দেন 'রোকেয়া মেমোরিয়া স্কুল'। পূর্ব পাকিস্তানে পর্দানসীন সমাজে মহিলাদের বাড়ির বাইরে কোনও কাজে যুক্ত থাকার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হয়েছিল। প্রতিবাদী সুফিয়া এই পরোয়ানার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। সে সময়ে সিলেটে চা-বাগানে পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের বেতনে বৈষম্যের ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন। একদিকে দেশের কাজ, মহিলাদের জাগিয়ে তোলা, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে গেছেন আজীবন। তিনি মূলতঃ ছিলেন কবি। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হোত কবিতার মাধ্যমে। এর ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতিবাদী মনোভাব প্রকটিত।

স্বাধীনতার পর যখন ভারত বিভাজন ঘটল, তখন আবার তিনি ঢাকায় চলে যান। সেখানে গিয়ে থেমে যাননি। সাহিত্যচর্চা ছিল পুরোদমে। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় স্বামীর অনুপ্রেরণা ছিল অপরিসীম। পাকিস্তান সরকার যখন রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করে শতবর্ষ উদ্‌যাপনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন; তখন সুফিয়া কামাল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রবীন্দ্রশতবর্ষ পালনের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, কামিনী রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তিনি সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৯৯-র ২০ নভেম্বর বীরাঙ্গনার প্রাণদীপ নির্বাপিত হয়। এমন একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মুসলিম নারীর তেজস্বী চরিত্র অনেকেরই অজানা, স্মরণ করা তো দূরের কথা। আজকে অনালোচিত এই মহিলার কথা তুলে ধরে তাঁর শতবর্ষে অঞ্জলি নিবেদিত হলো।

নমাজে হুঙ্কার : মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ার

শিবাজী গুপ্ত

গত বছর ময়দানে রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমবেত লক্ষ লক্ষ মুসলমান নামাজীরা যে হুমকি দিয়েছে ও রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেছে তাতে মুখ্যমন্ত্রী পুলক অনুভব করতে পারেন এবং মুসলমানদের বাড়বাড়ন্তের জন্য খোদার কাছে 'মাগফেরাত' কামনা করতে পারেন কিন্তু সে হুমকি আদৌ শূন্যগর্ভ নয়। পশ্চিমবঙ্গে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত বহিরাগত মুসলমান, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান এবং উচ্চ প্রজননশীল স্থানীয় মুসলমান মিলে যে বিরাট মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে (প্রায় ৩০ শতাংশ), তাকে অগ্রাহ্য করা কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। তার সঙ্গে তে-ভাগা চৌ-ভাগা ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোটার কোনওভাবেই পাল্লা দিতে সক্ষম নয়। তাই সব রাজনৈতিক দলই মুসলিম ভোটারদের লেজুড় হয়ে ঘুরছে। কারণ তারা যেদিকে কাৎ সেদিকেই জিৎ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সার বস্তুটি বুঝেছেন, তাই রোজ-নামাজ-ইফ্‌তার করে ও গায়ে হিজবা চাপিয়ে মুসলমানদের মন ভিজিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছেন। এখন মুসলমানরা শেষ পারানির কড়ি কড়ায়গণ্ডায় আদায় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এবং ঈদের নামাজের মতো পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্যে সমবেত লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সামনে রাজনৈতিক হুঙ্কার ছেড়েছে।

ঈদের আগে হিন্দু পত্রপত্রিকাগুলিতে 'খুশির ঈদ' 'খুশির ঈদ' বলে কী আদিখ্যেতা ও প্রতিবেদনের ছড়াছড়ি দেখলাম! বড় ইমাম ও ছোট ইমামদের ইসলাম কীর্তন পড়লাম। মুসলমান বালকদের কোলাকুলি ও বড়দের গলাগলির ছবি দেখে নয়ন-মন সার্থক করলাম। ভাবলাম, কী শান্তি কী পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সব! কিন্তু সব আবেগ উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলেন রেড রোডে 'ঈদের নামাজে'র পর প্রদত্ত কোয়ারি ফাজালুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক ভাষণ ও হুমকির মাধ্যমে। তিনি স্থানকাল ও উপলক্ষের কথা বিস্মৃত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি দিলেন তাদের দাবীদাওয়া অবিলম্বে না মেটালে তারা বামফ্রন্ট সরকারকে যেমন কবরে পাঠিয়েছে, তেমনি তৃণমূল সরকারকেও রাইটার্স থেকে উৎখাত করে ছাড়বে।

এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। ইসলাম ধর্ম একটি রাজনৈতিক ধর্ম। তাতে উদারতা, সহনশীলতা, আধ্যাত্মিকতার কোনও স্থান নেই। এমনকী ঈদের নামাজের পর ইমাম সাহেব যে খুৎবা পাঠ করেন সেটিও পুরোপুরি বিধর্মী বিদ্বেষে ও বিনাশে ভরা। অজ্ঞ জনগণের সন্দেহ নিরসনে খুৎবার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

"হে আল্লাহ, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদভাষী ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তার রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজারপুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকানপুত্র খাকান হউন...হে আল্লাহ্, আপনি তাঁকে সর্ব দিক দিয়ে সাহায্য করুন,...হে আল্লাহ্, আপনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারী দ্বারা বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন।... হে আল্লাহ্ আপনি ধ্বংস করুন কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোশরেকদের।" (দ্রষ্টব্য : 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত "মুসলিম পঞ্জিকা", বঙ্গাব্দ ১৭০৭, পৃষ্ঠা-১৬০) এই হুমকির ছ' মাস না পেরোতেই ভয়ে ভীতা হরিণীর মতো পশ্চিমবঙ্গের মৌলানা মুলায়মের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুসলমানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ, ইমামদের মাহিনা দান ও মোয়াজ্জেমদের 'আজান এলাউন্স' দান ব্রতে ব্রতী হয়েছেন। কারণ, মুসলমানরা শুধু গোরুর গোস্ত খায় না, হরিণীর গোস্তেও তাদের অরুচি নেই। মুসম্মৎ মমতা সে কথা খেয়াল রাখেন যেন।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

মার্কসবাদীদের বর্বরোচিত অসহিষ্ণুতা

অতিথি কলম

বলবীর কে পুঞ্জ

কেরলে সিপিএম ক্ষমতা হারিয়ে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখাতে শুরু করেছে তার রাজনীতির প্রতিপক্ষদের রক্তে স্নাত হয়ে। এমনকি, মানুষ স্তম্ভিত হচ্ছে যখন তারা দেখছে দলেরই এক বিক্ষুব্ধ নেতা টি. পি. চন্দ্রশেখরণকে উত্তর মালাবার অঞ্চলে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা হলো। দলের ইডুক্কি জেলাসচিব এম এম মানির জনসমক্ষে সদম্ভ ঘোষণা যে, দল অতীতে বেয়াড়া নেতাদের হত্যা করেছে এবং ভবিষ্যতে এমন নেতাদের হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না। এমনকি এইসব বেয়াড়া বিরোধী নেতাদের তালিকা প্রস্তুত বলে তাঁর সদর্প ঘোষণা।

> “আর এস এসের নেতৃত্বে মানুষ সংগঠিত হয়ে এই হিংসার মোকাবিলা করে। পরিণামে সংঘের এক কার্যকর্তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। আর তা করা হয় তাঁর ছাত্রদের সামনেই যখন তিনি শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ব্যস্ত ছিলেন। আর এই হত্যায় সামিল সেই কমিউনিস্টরাই।”

“১৯৮২ সালে আমরা কী করেছি? আমরা এদের তালিকা তৈরি করেছি।” মানির এমনই ঘোষণা এবং এই তালিকাভুক্ত নেতাদের ধরাধাম থেকে সরে যেতে হয়েছে। এইভাবেই লুকোছাপা না করে একথা জনসমক্ষে তিনি ঘোষণা করেন এবং আরও বলেন, এমন হত্যা আরও করা হবে আর এর মাধ্যমে পরিষ্কার যে সিপিএমের সামনে এটাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। টি পি চন্দ্রশেখরণ ছিলেন এমন নেতাদের মধ্যে একজন যিনি দলের সার্বিক পরাজয়ের দায় হিসেবে কিছু নেতাদের দুর্নীতি, জমি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়াকে পরাজয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং দলে এইসব নেতাদের অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হন। পুলিশি তদন্ত বলছে চন্দ্রশেখরণের ওপর চারবার হামলা হলেও খুনীরা শেষবার সফল হলো।

ইতিমধ্যেই তদন্তে দেখা গেছে যে, এই বিক্ষুব্ধ হত্যার পিছনে দল রয়েছে। আক্রমণকারীরা মার্কসবাদী না হলেও তারা কেরলের মাফিয়া চক্রে সামিল। পুলিশ-মার্কসীয় নেতাদের গোপন দরবারেই হত্যার পরিকল্পনা রচিত হয়। তদন্তে আরও বেরিয়ে এসেছে দু-দুবার হত্যার প্রচেষ্টা বিফল হবার পর এই চক্রান্তে সামিল হয় এক স্থানীয় নেতা।

কিন্তু এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে হবে না। ইডুক্কি জেলা সম্পাদক ইতিমধ্যে ফাঁস করে দিয়েছেন যে, হিংসার মূল উৎসে রয়েছে রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য ভূমিকা। উত্তর মালাবার অঞ্চলে যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী সেখানেই দলীয় হিংসার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

সম্প্রতি পার্টির ইতিহাস লেখা হয়েছে প্রাক্তন মার্কসবাদী নেতা মাধাভেট্টানের জীবন-চরিতে। এমনকি স্বাধীনতার পূর্বে ও মালাবার অঞ্চলে দলের বিস্তারের ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের খুন করা হয়েছে। কমিউনিস্টদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন কেরলের এক গান্ধীবাদী নেতা কে. কেলাপ্পান যিনি ‘কেরল গান্ধী’ নামেও পরিচিত ছিলেন। এই তালিকাতে কংগ্রেসী নেতা কে. মাধব রেড্ডী যিনি সি. রাজাগোপালাচারী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন যখন মালাবার অঞ্চল ছিল মাদ্রাজ প্রভিন্সের অংশ। অর্থাৎ স্বাধীনতার ঠিক পরে কংগ্রেসীরা কমিউনিস্টদের এই আক্রমণের যোগ্য জবাব দেওয়া শুরু করলেও অচিরেই নতুন দিল্লী মার্ক্সিস্ট হিংসার কাছে আত্ম-সমর্পণ করে।

মুসলীম লীগ এবং সিপিএমের মধ্যে লড়াই বাঁধে যখন যুযুধান দুই দল কেরলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে ব্যস্ত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তা হ্রাস পায় যখন লীগের একটা গোষ্ঠী কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধে। শেষমেশ আর এস এসের নেতৃত্বে মানুষ সংগঠিত হয়ে এই হিংসার মোকাবিলা করে। পরিণামে সংঘের এক কার্যকর্তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। আর তা করা হয় তাঁর ছাত্রদের সামনেই যখন তিনি শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ব্যস্ত ছিলেন। আর এই হত্যায় সামিল সেই কমিউনিস্টরাই।

আজ কেরলে টি পি চন্দ্রশেখরণকে যেভাবে ভাড়াটে গুণ্ডাকে দিয়ে খুন করা হলো--- এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় কয়েকদশক আগে সেই সংঘ সংগঠকের হত্যার ঘটনাকে। কংগ্রেসের সঙ্গে পালাবদল করে সিপিএম যখন ক্ষমতায় আসে তখন সমগ্র রাজ্য সরকারের মেশিনারী পুরোপুরি মার্ক্সীয় স্বার্থরক্ষা করে ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে এরা সাক্ষীকে

ভয় দেখায় এবং পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয়।

অবশ্য ইতিহাসের এমনই পুনরাবৃত্তি ঘটে যেখানে কমিউনিস্টদের সংগঠন তৃণমূল পর্যন্ত ব্যাপৃত। এরা পশ্চিমবঙ্গে লাগাতার ৩৪ বছর ক্ষমতায় আসীন। এরা বাহুবলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংগঠন, পুলিশ এবং ছাত্রসংগঠনগুলি জবরদখল করে নেয়। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসম সাহস এবং প্রতিজ্ঞায় তাঁর দল তৃণমূল বাংলাকে মার্ক্সীয় কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

উপরন্তু মার্ক্সবাদীদের নিয়মিত হিংসা সাধারণ মানুষদের দমিয়ে রেখেছে কেরলে ও বাংলায়। অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে আমরা দেখেছি সরকারের বিরুদ্ধে সিপিএমের আন্দোলন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই রাজ্যস্তরে হিংসা দমন করতে উদ্যোগ নেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কিন্তু সিপিআই-এর শীর্ষনেতা এবং পরে সিপিএম নেতা সুন্দরাইয়া, টি. নাগা রেড্ডি ও অন্যান্যরা এই হিংসা ও রক্তাক্ত আন্দোলনে অংশ নেন।

কমিউনিস্টদের এই ধাঁচের আন্দোলন কেবল ভারতে নয়, সারা বিশ্বজুড়ে এর নজির মেলে। মাও জে দং-র কমিউনিস্ট আন্দোলন চীনে কমপক্ষে ৩ কোটি মানুষকে হত্যা করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়। এই তথ্যের স্বীকৃতি মেলে উত্তরসূরীদের তথ্যে। বর্তমানে চীনে কমিউনিস্ট শাসনের ৬০ বৎসর উৎযাপিত হচ্ছে এবং অনেক বুদ্ধিজীবীদের মতে 'লাল হত্যার' বলি ৩ কোটিরও অনেক বেশী।

সোভিয়েত রাশিয়াতেও যখন এন এস ক্রুশ্চেভ অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় বসেন তখন তিনি নিজেই তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, জোসেফ স্ট্যালিনের আমলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে স্ট্যালিন বহু কমিউনিস্ট নেতাদের কোতল করেছেন তা তথ্যের মাধ্যমে স্বীকৃত। ইতিহাস বলছে যে প্রতিপক্ষ সাফাই-এ স্ট্যালিন দক্ষ বলে জর্জিয়া থেকে লেনিন স্ট্যালিনকে নেতৃত্বের উচ্চপদে এনে বসিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মস্কো দখল অভিযানে নিজের পথ পরিষ্কার করতে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে লেনিনের সঙ্গে যে গোষ্ঠী ক্ষমতায় ছিল সেই গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন স্ট্যালিন। এদের প্রত্যেককে সেই বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং স্ট্যালিন প্রত্যেককেই নীরবে কোতল করেছিলেন। সুতরাং শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বাংলায় কমিউনিস্টদের জন্য কবর খনন করেন বা কেরলে ইউ ডি এফ সরকার মিঃ মানি-র বিচারের ব্যবস্থা করেন তবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এই দুই ঘটনা হবে অতীতে কমিউনিস্ট নেতাদের দ্বারা প্রতিহিংসার অনুসরণ, তা সে ভারতবর্ষে-ই হোক বা চীনে অথবা রাশিয়ায়।

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

মণিপুরী জঙ্গি ও মাওবাদী বোঝাপড়া

মাওবাদী-পি এল এ যৌথ মহড়া।

বাসুদেব পাল ॥ পূর্ব ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উগ্রপন্থী অধ্যুষিত এবং সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত রাজ্য হলো মণিপুর। মণিপুরে অনেক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের মধ্যে শক্তিশালী হলো পি এল এ (পিপলস্ লিবারেশন আর্মি)। পি এল এ-র সঙ্গে আবার অনেকটাই মিল আছে অসমের উলফা-র (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম)। পি এল এ উলফার চেয়ে একটু পুরনো জঙ্গি গোষ্ঠী।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন বিপথগামী মণিপুরী

মায়ানমারে পি এল এ নেতা।

যুবক এন বিশ্বেশ্বর সিংহের নেতৃত্বে চীনে যায়। সেখানে চীনা কমিউনিজমে তাদের ব্রেনওয়াশ করা হয়। 'লিবারেশন আর্মি' প্রায় সব সাম্যবাদী দলের সশস্ত্র বাহিনীর নাম। চীনের সেনাবাহিনীর নাম— 'পিপলস্ লিবারেশন আর্মি'। সেক্ষেত্রে পি এল এ তাদের নামটা চীন থেকে ধার করেছে বলা যায়।

১৯৮০-তে সেনা অভিযান পি এল এ-র কোমর ভেঙে দেয়। কিন্তু পরবর্তী তিরিশ বছরে 'পি এল এ' নতুন করে শুধু সংগঠিতই হয়নি, একই সঙ্গে মাওবাদীদের মূল পরিকল্পনাকার এবং আধুনিক সমরাস্ত্রের যোগানদারের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছে। ''একটা সময় ছিল যখন পি এল এ জঙ্গি-ক্যাডাররা নাগাল্যান্ডের এন এস সি এন জঙ্গিদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিত এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করত। কিন্তু পি এল এ এখন নিজেরাই মাওবাদীদেরকে একই পরিষেবা প্রদান করছে। এজন্য মাওবাদীদের সঙ্গে তাদের এক চুক্তি হয়েছে।'' একথা জানিয়েছেন জঙ্গি নেটওয়ার্ক বিরোধী অপারেশনে নিযুক্ত এক উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার।

পি এল এ এবং মাওবাদীদের মধ্যে ওই চুক্তিপত্র ২০০৮-এর ২২ অক্টোবর স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেইমতো পি এল এ-র প্রশিক্ষকরা ঝাড়খণ্ডের মাও-ডেরায় গিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিত। আবার মায়ানমারের পি এল এ-র বেসক্যাম্পে গিয়েও মাও ক্যাডাররা একসঙ্গে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে। দীর্ঘদিন থেকে প্রচুর নিরাপত্তাবাহিনী এবং সেনা মোতায়েন থাকলেও পি এল এ-মাওবাদী বোঝাপাড়ার খবরটা অতি সম্প্রতি তাদের নোটিশে এসেছে। সম্প্রতি ধৃত পি এল এ ক্যাডারদের সংখ্যাটা দেখলেই বিষয়টা টের পাওয়া যায়। শুধুমাত্র অসমের গুয়াহাটিতেই ডজনখানেক উঁচু স্তরের পি এল এ ক্যাডার ধরা পড়েছে। তখনও পি এল এ-মাওবাদী বোঝাপড়ার খবরটা প্রকাশ্যে আসেনি। একথা জানিয়েছেন ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এন

মাওবাদী নেতাদের সম্পর্কে কয়েকটি প্রাপ্ত তথ্য

- **ইন্দ্রনীল চন্দ ওরফে রাজ (৩৭ বৎসর) :** কলকাতায় ধৃত। বর্তমানে এন আই এ-র হেফাজতে আছে। পি এল এ-র কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাওবাদীদের কাছে পৌঁছে দিত। অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাওবাদ প্রসারে দায়িত্বে ছিল। ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে।
- **পল্লব বরবরা :** ২০১১-তে ওড়িশা থেকে গ্রেপ্তার। প্রাক্তন উলফা নেতা। সে বার বার বলেছে যে, সে পি এল এ-র সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকায় ছিল। বর্তমানে নকশাল নেতা।
- **অশিক সব্বর এবং তিঙ্গারাই :** অসমের চা বাগানে মাওবাদী সমর্থক জনজাতি দলের নেতা। এরা পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে ওড়িশা ঝাড়খন্ড সীমান্তে মাওবাদীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

আই এ) একজন সিনিয়র অফিসার।

মাও-পি এল এ যৌথ যোগাযোগের টাটকা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে মে মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ পল্লব বরবরা ওরফে প্রফুল্ল ধরা পড়ায়। পল্লবকে অসমে মাও এবং পি এল এ-র মধ্যে প্রধান সংযোজক বা লিঙ্কম্যান বলেই জানা গেছে। এন আই এ আরও দু'জন প্রমুখ পি এল এ- ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের একজন এন দিলীপ সিং ওরফে ওয়াংবা এবং দ্বিতীয়জন বছর সাঁইত্রিশের ইন্দ্রলীল চন্দ ওরফে রাজ। এন দিলীপ সিং পি এল এ-র বিদেশ বিভাগের প্রধান। ইন্দ্রনীল চন্দ আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাচালানকারী এবং অসমে মাওবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধির মূল উদ্যোগী। প্রফুল্ল এবং রাজ-এর সাহায্যেই ওয়াংবা শীর্ষস্থানীয় মাও নেতা কিষানজীর সঙ্গে ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে সাক্ষাৎ করেছিল বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছেন। এন আই এ ওয়াংবার বিরুদ্ধে যে চার্জশীট পেশ করেছে তাতে জানা গেছে যে, ওয়াংবা নকশাল বা মাও ক্যাডারদের দু'মাস যাবৎ গেরিলা লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যোগাযোগ, রণনীতি ছাড়াও সে মাওবাদীদের ওয়ারলেস সেট এবং অস্ত্রশস্ত্রও সরবরাহ করেছে।

ধৃত এন দিলীপ সিং ওরফে ওয়াংবা।

এন আই এ-র গোয়েন্দারা পি এল এ এবং মাওবাদীদের পাঁচশতাধিক ই-মেল আদান প্রদানের প্রমাণও উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে একটিতে পি এল এ ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্যে ৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই-এ সাফল্যের জন্য কমরেডদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ওই একইদিনে শীর্ষ মাও নেতা গণপতি ওয়াংবাকে এক ই-মেল মারফৎ গেরিলা লড়াইয়ে সাহায্যের জন্য পি এল এ-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এসবই চার্জশীটে উল্লেখ করা আছে।

এন আই এ-মাওবাদী শীর্ষনেতাদের তালিকায় প্রশান্ত বোস বা কিষেনদার নামও যোগ করেছেন। এন আই এ-র দাবি মতো সেই মাও দলটিকে নেতৃত্ব দিয়ে চার বছর আগে মায়ানমারে নিয়ে গিয়েছিল সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে।

পি এল এ ছাড়াও মাওবাদীদের সঙ্গে অসমের উলফা, এন এস সি এন (আই এম) এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ মণিপুরের যোগাযোগের সংবাদ পাওয়া গেছে। মাওবাদীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মণিপুরের কাংলেইপাক কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের নতুন নামকরণ করেছে— মাওয়িস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি অফ্ মণিপুর।

সম্প্রতি অসমে একটি ভয়াবহ ঘটনা নজরে এসেছে। বিগত ২/৩ বছরে অসমের শ'তিনেক যুবক বেপাত্তা হয়ে গেছে। তাঁদের খোঁজ মিলছে না। এই সময়ে প্রথম সারির মাওবাদী নেতারা অসমে বিভিন্ন বয়সের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং বৈঠক করেছেন। ওই নিখোঁজ যুবকরা মাওবাদী ক্যাডারের তালিকায় নাম লিখিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের মগজে মাওবাদী তত্ত্ব ঢোকানো হয়েছে বলে জনৈক এন আই এ অফিসার জানিয়েছেন।

এন আই এ (ন্যাশন্যাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)-র ডাইরেক্টর জেনারেল এস সি সিন্‌হা অসম পুলিশের ডি জি-জে এন চৌধুরীকে তাঁর কয়েকজন অফিসারকে ডেপুটেশনে এন আই এ-তে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পি এল এ নেতাদের বিষয়ে প্রাপ্ত কয়েকটি তথ্য

এন দিলীপ সিং ওরফে ওয়াংবা :

পি এল এ-র বিদেশ বিভাগের প্রধান। তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ--- তিনি কিষেণজীর সঙ্গে দেখা করেছেন। ওড়িশা-ঝাড়খন্ড সীমান্তে মাও ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ওয়াংবা ২০০২-তে পি এল এ-তে যোগ দেন। বাংলাদেশে তিন বছর কাটিয়েছেন।

সেনজাম ধীরেন সিং এবং কে আর্নল্ড সিং :

এই দুজনকে এন আই এ গ্রেপ্তার করেছে।

অসীম ইবোতোম্বি সিং ওরফে এস এস অনগৌ :

পি এল এ-র বিদেশ দপ্তরের সচিব। ওড়িশায় গ্রেপ্তার। ইনিও মাওবাদীদের ঝাড়খন্ড সীমান্তে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ওড়িশার গোপালপুরে সক্রিয় নিজ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার হন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন পড়ান

‘গ্রামের লোকেরাই ফাঁসিয়েছে’ — মুসলিম মেয়ের স্বীকারোক্তিতে বেকসুর খালাস হিন্দু যুবক

সংবাদদাতা : মালদা॥ মালদা জেলাতে হিন্দু কলেজছাত্রী ও যুবতীদেরকে মুসলমান যুবকদের বিয়ে করার ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এটা ‘লাভ জেহাদ’-এরই রকমফের বলে অনেকে মনে করছেন। অথচ হিন্দু যুবকরা মুসলিম মেয়েকে ভালবাসলে বিরাট অপরাধের পর্যায়ে পড়ছে এবং সেক্ষেত্রে হিন্দু পরিবারটি আক্রান্ত হচ্ছে। মালদা জেলার ইংলিশবাজার থানার মহারাজপুর কাঞ্চনতার গ্রামের কৃষ্ণ সাহা একজন দিনমজুরের ছেলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক মুসলিম যুবতীকে ভালবেসে ছিল বলে গত বছর পূজার সময় তাকে মুসলিমরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তার গোটা পরিবারটিকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছিল এবং কৃষ্ণ সাহাকে মিথ্যা ধর্ষণের মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়েছিল। স্বস্তিকাতে এই খবরটি তখন বের হয়। কৃষ্ণ সাহার বাবাকেও দুষ্কৃতীরা প্রচণ্ড মারধর করেছিল। পরবর্তী সময়ে বোমা-পিস্তল নিয়ে বিরাট দাঙ্গা লাগানো হয়। গত ২৮ মে কৃষ্ণ সাহা নির্দোষ প্রমাণিত হয়। বিচারক রায় দেন বেকসুর খালাসের।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এন্তাজ আলী, স্কুলের কেরাণী জুল্লুর রহমান ও প্রাক্তন বি.এস.এফ. জওয়ান আজিজুল হক সহ বেশ কিছু মুসলিম চক্রান্ত করে কৃষ্ণ সাহাকে ১২ বছরের জন্য জেলে ঢুকিয়ে পরিবারটিকে মুসলিম করতে চেয়েছিল। কেননা কৃষ্ণ সাহা তিন মাস জেলে থাকাকালীন মুসলিমদের পক্ষ থেকে কৃষ্ণর বাড়িতে বার্তা পাঠানো হয়েছিল যে যদি তারা সপরিবারে মুসলিম হয়ে যায় তবে তাদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কিন্তু কাঞ্চনতার ও মহারাজপুরের হিন্দুরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে কৃষ্ণ সাহা ছাড়া পাওয়ার পর জেলা আদালতে গত দুই মাস ধরে বিচার চলেছিল। ১৬ জন মুসলিম মহিলা ও পুরুষ মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছে বলে মিথ্যা সাক্ষী দিলেও ‘মেয়েটির’ সত্য কথা বলার জন্য কৃষ্ণ সাহা বেঁচে গেল। মেয়েটি আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিল যে ধর্ষণের ঘটনা মিথ্যা ও সাজানো, আমি কৃষ্ণ সাহাকে ভালবেসেছি বলে আমাদের গ্রামের লোকেরাই তাকে ফাঁসিয়েছে। আমি কৃষ্ণকে বিয়ে করতে চাই। বিচারক ১৬ জনের মিথ্যা সাক্ষ্য ও মেয়েটির কথা শুনে কৃষ্ণ সাহাকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেয়। কিন্তু স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন, যারা হিন্দু যুবক এবং তার গরীব পরিবারকে আর্থিক দুর্দশার মধ্যে ফেলে হয়রানি করল, তাদের কি কোনও শাস্তি হবে না? যাদের জন্য এত বড় একটি দাঙ্গার ঘটনা ঘটল এবং এম এল এ এবং এম পি মারফৎ মুসলিমরা আক্রান্ত বলে গুজব দিল্লী পর্যন্ত গিয়েছিল, তাদের তোষণ করতে গিয়ে কেন পুলিশ প্রশাসন এই পরিবারটিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিল? সত্যি কথা বলতে গেলে সামান্য জমি ও গোরু বিক্রি করে আদালতে খরচ চালাতে গিয়ে এই পরিবারটি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে অথচ বোমা-পিস্তলসহ যে সব মুসলিমরা মহারাজপুর থেকে ধরা পড়েছিল তাদের অল্প কিছুদিন পরেই ছেড়ে দিলেও পুলিশ হিন্দুদের ধরে নিয়ে গিয়ে মিথ্যা মামলায় জামিন অযোগ্য ধারাতে ফেলেছিল। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ— মহারাজপুর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে সুজাপুরে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে প্রচুর আগ্নেয় অস্ত্র মহারাজপুর গ্রামে ঢুকেছিল এবং এখনও অস্ত্র মজুত রয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশকে জানানো হলে তারা এর প্রমাণ দিতে বলে। গ্রামবাসীরাই যদি প্রমাণ দেবে তবে পুলিশের ভূমিকা কি থাকল? যদিও গত ৩০ মে কালিয়াচকের ও বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে গয়েশবাড়ি অঞ্চলের বাখরপুর থেকে ১৭৫টি বোমা সহ ৭টি মাস্কেট উদ্ধার করেছে।

পুলিশ ২৫ জন মুসলিম দুষ্কৃতীর নাম জানতে পেরেছে। আসলে রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে পুলিশ সব জেনেশুনেও হিন্দুদের সঙ্গে দুয়োরাণীর মতো ব্যবহার করছে বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

দেবমূর্তিকে স্নান করাচ্ছেন পুরোহিতরা

ভুলে যাওয়া পার্বণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভু-ভারতের কথা বাদ দিন, কেরলকেও ধর্তব্যের তালিকায় না রেখে স্রেফ মালায়ালম ভাষা-ভাষী মানুষদের মধ্যেও হরিমাত্তম মন্দির উৎসবের কথা কতজন জানেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রতি বছর মালায়ালম চান্দ্রেয় দিনপঞ্জী অনুযায়ী আমবালামেদুতে চলে আসছে এক ব্যতিক্রমী উৎসব। এবছরও ২ থেকে ১০ মে এই উৎসব হয়েছে। আমবালামেদু জায়গাটা হলো কোচি-র শহরতলী-তে, ঘন জঙ্গলে ঢাকা তফঃশিল এলাকাভুক্ত। আটদিনের এই উৎসবটা কিন্তু একান্তভাবেই ওই অঞ্চলের অধিবাসী মালয়ালী ব্রাহ্মণদের। শিবঠাকুর ও মহাবিষ্ণুর উপাসনা করা হয় হরিমাট্টাথু শ্রী মহাদেবের মন্দিরে। এই মন্দিরটাই হরিমাত্তম মন্দির নামে পরিচিত।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ।

ওই আটদিন ধরে সেখানে নিরন্তর চলে রামায়ণ-চর্চা, কথোপকথন ও আলোচনা। হাতিদের দামি পোষাক

পুরোহিতের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা হাতির।

পরিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। তারপরে ঠাকুর-দেবতার মূর্তি নিয়ে মন্দিরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করা হয়। এবং আমবালামেদু হ্রদে মূর্তিগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়। গত ৪৪ বছর ধরে এভাবেই এখানে পালিত হয়ে আসছে হরিমাত্তম মন্দির উৎসব। কিন্তু তীর্থযাত্রী বা পর্যটক টানার নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে আমবালামেদু। এখানকার মনোরম দৃশ্যপটও পর্যটক টানতে সক্ষম হয় না কেন, তা মনে হয় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য ঘটনা! আগে কর্মচঞ্চল নগরীর কর্মতৎপরতা থাকায় এই উৎসব স্থানীয়ভাবে অন্ততঃ জনপ্রিয় ছিল। পরের দিকে ওই ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষেরা জীবিকার তাগিদে এলাকার বাইরে চলে যেতে শুরু করলে, উৎসবের জৌলুস স্বাভাবিক নিয়মেই কমে যায়। প্রথম প্রথম উৎসবের টানে সেই চলে যাওয়া মানুষরা যাও বা আসতেন, পরের দিকে সেই টানও ফিকে হয়ে যায়। এখন উৎসবটি টিকিয়ে রাখাই স্থানীয়দের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

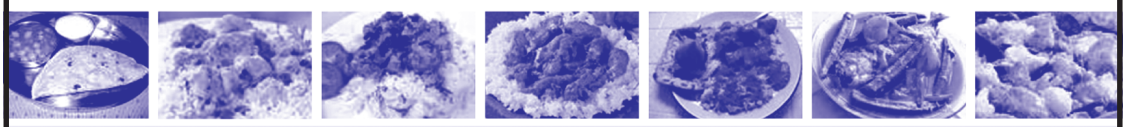

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির দক্ষিণবঙ্গের গ্রীষ্মকালীন শিবির

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন শিবির গত ২০ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হৃদয়পুরের প্রণব কন্যা সংঘের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো। বিভিন্ন জেলা থেকে ৬৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০ মে সঙ্ঘের সহ-সভানেত্রী সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী মা শিবিরের উদ্‌ঘাটন করেন। শিবিরে অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা সুলভাতাই দেশপাণ্ডে, কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রমুখ চিত্রাতাই যোশী, সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতিতাই হালদেকর, সেবা প্রমুখ সন্ধ্যাতাই টিপরে, প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার ছাড়াও প্রান্ত স্তরের কার্যকত্রীগণ উপস্থিত সেবিকাদের বিভিন্ন বিষয়ে মার্গদর্শন করান। প্রণব কন্যা সংঘের সহ সম্পাদিকা সন্ন্যাসিনী বিদ্যানন্দময়ী মা আচার্য প্রণবানন্দের জীবনী ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে তাঁর চিন্তা সেবিকাদের সামনে ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ অসীম মিত্র হিন্দুধর্ম ও বিবেকানন্দ বিষয়ে বৌদ্ধিক দেন। ৩ জুন রবিবার জ্ঞানানন্দময়ী মা-র সভানেতৃত্বে সমারোপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বহু অভিভাবিকা, সজ্জন ব্যক্তি এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আশীর্বচন প্রদান করেন। সমিতির বিষয়ে উপস্থিত সকলকে অবহিত করান মুখ্যবক্তা সন্ধ্যাতাই টিপরে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সেবিকারা বিভিন্ন বিষয়ে শারীরিক শিক্ষা প্রদর্শন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন প্রান্ত কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার।

শোকসংবাদ

গত ২৮ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাবুডুমরো নিবাসী সৃষ্টিধর সাউ-এর পিতৃদেব ভূতনাথ সাউ বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোক গমন করেছেন। তিনি তিন পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেলেন।

***

গত ১২ মে ঝাড়গ্রাম নিবাসী সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী বংশী ঘোষাল পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

***

গত ৫ জুন মেদিনীপুর হাসপাতালে সঙ্ঘের প্রাক্তন মেদিনীপুর বিভাগ কার্যবাহ প্রয়াত স্বপনকুমার ঘোষের মাতৃ দেবী পরলোকগমন করেছেন। তিনি পুত্রবধূ, নাতনী ও অগণিত গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের তিনি সদাসর্বদা সন্তানবৎ স্নেহ করতেন।

***

গত ৬ জুন সিউড়ী মহকুমার ব্যবস্থা প্রমুখ ও বীরভূম সেবা ট্রাস্টের সম্পাদক কালোসোনা

সমাবেশ সমাচার

মণ্ডলের পিতা অমূল্যরতন মণ্ডল ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বর্তমানে তিন পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

গত ১২ মার্চ শিলিগুড়ির কাছে যোগমালী নিবাসী ডাঃ স্মরজিৎ ঘোষ নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, সাত পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

উত্তর ২৪ পরগণার আখড়াতলা গ্রামে মারাংগুরুর থানে তখন আধুনিক বাদ্যের তালে সবাই মাতোয়ারা হয়ে কোমর জড়িয়ে নৃত্যরত। সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিছু সময় বন্ধ রাখা হলো নৃত্যগীত। মা সুন্দরী সর্দার সমাজের কল্যাণে পুত্র শিবু সর্দার ও পুত্রবধূ শিখা সর্দারের হাত দিয়ে ৭০০ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে সমর্পণ করলেন সঙ্ঘের উত্তর চব্বিশ পরগণা বিভাগ প্রচারক আশিস মণ্ডলের হাতে। সমবেত বনবাসী সমাজ করতালিতে অভিনন্দিত করলো এই শুভ প্রয়াসকে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়ার আগমন উপলক্ষে গত ১০ জুন বিকেলে ফরাক্কায় নেতাজী ময়দানে পরিষদ আয়োজিত জনসভার একাংশ।

ফঃ ৫

জাড়া জমিদারবাড়িতে কবিগান প্রসঙ্গে

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ

রায়বাবুদের রামেশ্বরের 'চাঁদনি' মন্দির (১৭৯৫ খৃঃ), জাড়া (চন্দ্রকোণা), পশ্চিম মেদিনীপুর।

স্বস্তিকা ৬৪ বর্ষ ৩৭ সংখ্যায় ড. প্রণব রায়ের লিখিত 'জাড়ার মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় ''জাড়ার জমিদার রায় বাবুদের বিশাল প্রাসাদ ও বিভিন্ন মহল দীর্ঘকাল জরাজীর্ণ ও ভগ্ন হলেও তা এই অঞ্চলের এক দর্শনীয় পুরাকীর্তি বা হেরিটেজের পর্যায়ে পড়ে।''

শুধু জাড়া কেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট বড় অনেক জমিদার বংশের বসতবাটি চকমেলানো দালান, কেল্লা, কুঠি, মন্দির, পুকুর দীঘি সরোবরই জরাজীর্ণ ভগ্নদশা। দীঘি পুষ্করিণীগুলি কচুরিপানা ও ঝোপজঙ্গলে ঢাকা পড়েছে।

জমিদারদের অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন নিয়ে কাঁদুনি গাওয়া একটা চলতি প্রথা। তা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও কিছুটা যে সত্য তা অস্বীকার করা যায় না। কোনও প্রজার খাজনা বাকি পড়লে তা আদায়ের জন্য জোর জবরদস্তি যে না হোত তা নয়। নির্দিষ্ট সময়ে সরকারে ভূমি রাজস্ব জমা দিতে না পারলে জমিদারি যে লাটে উঠবে তাও তো ভুললে চলবে না। আবার খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি অর্থাৎ জমিদারগণ খাজনার উপর নানা রকম শুল্ক ধার্য করে প্রজার ঘাড়ে বাড়তি বোঝা চাপাত তাও অস্বীকার করা যায় না। তবে সেসব অবৈধ আদায় রহিত করার ভার তো সরকারের
হাতে। কিন্তু সরকার নিজের প্রাপ্য বুঝে পেয়েই খুশি; প্রজাদের দুঃখকষ্ট নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করত না।

কিন্তু সমাজে এই তালুকদার/জমিদার বা মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অবদানের কথা ভুললেও চলবে না। বলতে গেলে জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগহীন এই জমিদারগণই ছিল সমাজরক্ষক, সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখার মূল খুঁটি। এরা শোষক হলে শাসকও ছিল, আবার রক্ষক এবং পোষকও ছিল, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। দুষ্ট জমিদার যেমন ছিল, দুষ্ট-প্রজাও ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে হিন্দু জমিদারগণ বা তাদের প্রতিভূ নায়েব গোমস্তারা ছিলেন হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির, পূজা-পার্বণের, দেবদেউল, মন্দির, পাঠশালা, টোল ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক। ইংরেজ আমলে গ্রামাঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা, পোস্টঅফিস স্থাপন, চলাচলের পথ, পানীয় জলের পুষ্করিণী দীঘি খনন ইত্যাদি কাজেও জমিদারদের অবদান, সরকারের তুলনায় জমিদারদের ভূমিকা নগণ্য ছিল না।

কিন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে জমিদারদের ভূমিস্বত্ব লোপ করে সে কাঠামোই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলে হিন্দু সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে হিন্দুরা রক্ষকহীন হয়ে পড়ে। সে স্থলে ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত পঞ্চায়েতগুলি হিন্দুদের রক্ষক না হয়ে, ক্রমবর্ধমান বিধর্মী সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। সমস্ত জমিদারবাড়িগুলি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষণায় চালিত হিন্দুধর্ম সমাজসংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যাই হোক, তথাকথিত বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক জমিদার/তালুকদার শ্রেণীকে আইনের বলে, গায়ের জোরে উৎখাত করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। প্রাক্তন পূর্ববঙ্গে তাদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না। সেসব জমিদারদের বাস্তুভিটা দখলের সঙ্গে দেবদেবীর নামে উৎসর্গিত দেবোত্তর সম্পত্তিও দখল করে নেওয়া হয়েছে, সেবক ও সেবাইতদের দেশছাড়া করা হয়েছে। মাঝে মাঝে অতি বৃহৎ জমিদার বাড়ি ও তাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রগুলোর ধ্বংসপ্রায় অবস্থার কথা কাগজে দেখা

বাঁকা রায় ও ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' মন্দির, জাড়া, চকবাজার (চন্দ্রকোণা), পশ্চিম মেদিনীপুর।

যায়— যেমন ঢাকার তেওটিয়া জমিদারবাড়ি, ময়মনসিংহের গৌরীপুর, সুসঙ্গ, মুক্তাগাছা, রাজশাহীর নাটোর পুটিয়া, নোয়াখালির দালালবাজারের ঝুলনবাড়ি ইত্যাদি। দু' পাঁচটির কথা উল্লেখ থাকলেও এরকম অসংখ্য জমিদারবাড়ির দেবালয় আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, বিলোপ হয়ে গেছে, হস্তান্তরিত ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। ফলে সেদেশে হিন্দু সমাজের মূল কাঠামোই গুঁড়িয়ে গেছে।

অভিভাবকহীন হিন্দু সমাজও ছিন্নভিন্ন হয়ে দেশান্তরিত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের উপাস্য দেবদেবীও উদ্বাস্তু হয়ে এ বঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে।

উক্ত প্রবন্ধে ড. রায় জাড়া জমিদার বাড়িতে শীতলাপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কবিগানের বহুল প্রচলিত গানটির খণ্ডিত উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং দুজন কবিয়ালের উল্লেখ করেছেন। কবিগানের ইতিহাস নিয়ে যতটুকু আলোচনা নজরে এসেছে, তাতে হরিবোল দাস ও জগা ধোপার কোনও উল্লেখ চোখে পড়েনি। তবে গানের বাঁধুনি ও শব্দ বিন্যাস দেখে এটি ঠোঁটকাটা ভোলা ময়রার রচনা বলেই অনুমিত হয়। বিভিন্ন সূত্রে রাজবাড়িতে কবিগানের যে আলোচনা দেখা যায়, তা থেকে জানা যায় জাড়া রাজবাড়িতে কবিগানের যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে কলকাতা থেকে ভোলা ময়রা আমন্ত্রিত হয়ে আসে এবং তার বিপক্ষে জগা (জগন্নাথ বা জগবন্ধু বেনে) নামে কিঞ্চিৎ অনামী এক কবিয়ালকেও বায়না করা হয়। কবি জগা আসরের শুরুতেই জাড়াকে গোলোক বৃন্দাবন এবং রাজাবাবুদের কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে উপমা দিয়ে এক তৈলাক্ত গান পরিবেশন করে। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ভোলা ময়রা তাৎক্ষণিক পদ যোজনা করে গেয়েছিল :

কেমন করে বললি জগা, জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
হেথায় বামুন রাজা চাষা প্রজা—
চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।।
জগা, কোথারে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথারে তোর রাধাকুণ্ড,
পাশে আছে মাণিককুণ্ড—করগে মূলা দরশন।।

(এই মাণিককুণ্ড গ্রামে না কি পাঁচ সাত সের ওজনের মূলা উৎপাদিত হোত)

কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা—
কৃষ্ণ বলি কারে।
অসার সংসারে জগা—তরাইতে পারে।।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফতের মধু অলি।
মাপ করগো রায়বাবু, দুটো সত্য কথা বলি।।
জগা বেনে খোসামুদে অধিক বলবো কি,
তপ্তভাতে নুনের ছিঁটে, পান্তাভাতে ঘি।।
ওরে কবি গাইবি, পয়সা নিবি—
খোসামুদি কি কারণ?
কেমন করে বললি জগা—জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।।

জমিদারদের মুখের উপর এমন সদম্ভ উক্তি জমিদারের এলাকাবাসী কোনও কবিয়ালেরই মুখে জোগাত না। ভিটেছাড়ার ভয় আছে না!

(ছবি সৌজন্যে : ডঃ প্রণব রায়)

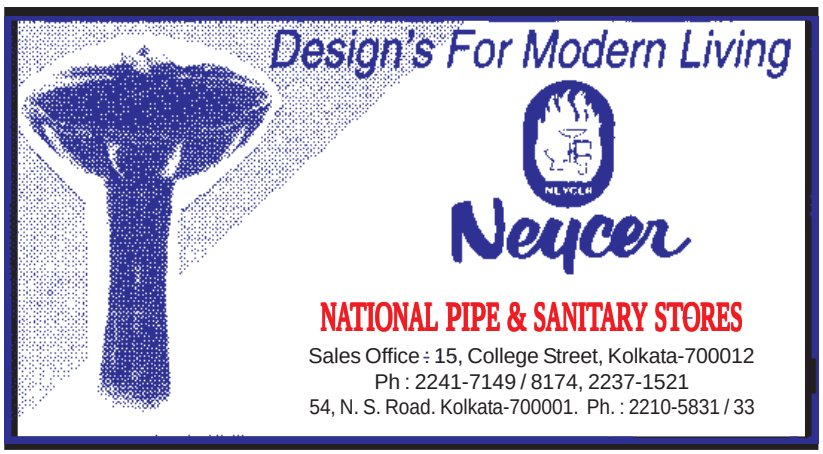

যোগে রোগ মুক্তি

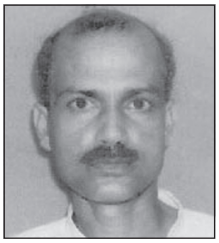

আশীষ পাল

ঘাড়ের ব্যথা
(সারভাইক্যাল স্পন্ডেলাইটিস)

যেমন কোমরে বাত, হাঁটুতে বাত হয়, ঠিক তেমনি ইংরাজি ভাষায় সারভাইক্যাল স্পন্ডেলাইটিস বলা হয় ঘাড়ের বাতকে। ঘাড় মানে নেক। বসে বসে সামনে ঝুঁকে কাজ করতে করতে ঘাড়ের ব্যথা সৃষ্টি হয়ে থাকে। হাড়ের ক্ষয় বা পরিবর্তন হওয়া, পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে ঘাড়ের ব্যথা হয়ে থাকে। নীচে কিছু আসন, ব্যায়াম ও মুদ্রা দেওয়া হলো যাতে ঘাড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রথম প্রক্রিয়া : বজ্রাসনে/ সুখাসনে/ দাঁড়িয়ে করা যায়। দু' হাতের আঙুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে আটকে বুকের কাছে রাখা, তারপর শ্বাস নিতে নিতে আটকানো অবস্থায় হাত দুটোকে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া, তালু বাইরের দিকে টানা। তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দু-হাতকে পূর্বের অবস্থায় বুকের কাছে নিয়ে আসা। এই ক্রিয়া ১০ বার করা।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া : বজ্রাসন/সুখাসনে/ দাঁড়িয়ে করা যায়। পূর্বের মতো দু-হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে আটকে বুকের কাছে রাখা। তারপর শ্বাস নিতে নিতে দু-হাত আটকানো অবস্থায় একটু ঘুরিয়ে বুকের সামনে দিয়ে মাথার উপর তোলা এবং তালু আকাশের দিকে টানা। দৃষ্টি হাতের দিকে, ২০ সেকেণ্ড থেকে ১ মিনিট শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা। ২ বার অভ্যাস করা।

তৃতীয় প্রক্রিয়া : বজ্রাসনে বসা। সামনের দিকে ঝুঁকে দু-হাতের কনুইকে একটু দূরে মাটিতে রেখে দু-হাতের তালুর উপর থুতনি লাগিয়ে চাপ দেওয়া। নিতম্ব যেন না ওঠে। এইভাবে ১ মিনিট থাকা, শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক অবস্থায়। তারপর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা।

চতুর্থ প্রক্রিয়া : বজ্রাসন/সুখাসনে/ দাঁড়িয়ে করা যায়। দু-হাত মুষ্টি অবস্থায়

কাঁধের ওপর রাখা। কনুই-কাঁধের সমান্তরাল রাখা, তারপর দুটো কনুইকে বুকের সামনে মিলিয়ে বৃত্তাকার ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘোরানো। উপর ও নীচ থেকে ১০ বার করা।

পঞ্চম প্রক্রিয়া : বজ্রাসন/সুখাসনে/ দাঁড়িয়ে করা যায়। দু-হাতে মুষ্টি অবস্থায় কাঁধের উপর রাখা, কনুই কাঁধের সমান্তরাল রাখা এবং বুক টানটান। তারপর শ্বাস নিতে নিতে দুই কনুইকে সামনের দিকে এক সঙ্গে করা, ১০ সেকেন্ড থাকার পর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় ফেরা। এই ভাবে ১০ বার করা।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া : বজ্রাসন/সুখাসনে/দাঁড়িয়ে করা। দু-হাতের আঙুল দিয়ে দু-হাতের কব্জি চেপে ধরে ওপরের দিকে উঠিয়ে মাথার পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া। শ্বাস ভেতরে টেনে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতকে ডান দিকে মাথার পিছনের দিকে টান ঘাড় আর মাথা স্থির থাকবে। তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটোকে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং বিপরীত দিকে করা। এই ক্রিয়া ৫ বার করে করা।

সপ্তম প্রক্রিয়া : সুখাসনে বসে মাথার পিছনে দু-হাতের তালু দিয়ে চাপ দেওয়া এবং পিছন দিকে নেবার চেষ্টা করা। অনুরূপভাবে মাথার সামনে বা কপালে চাপ দেওয়া ও সামনের দিকে ঝোঁকানোর চেষ্টা করা। হাত ও মাথার চাপ সমান থাকায় মাথা সোজাই থাকবে। এই ভাবে ডান হাতের তালু দিয়ে মাথার ডান দিকে, বাঁ হাতের তালু দিয়ে মাথার বাঁ দিকে এবং পরে দু-হাতের তালু থুতনির নীচে রেখে চাপ দেওয়া ও মাথা নীচের দিকে নামানোর চেষ্টা করা। হাঁটুতে ব্যাথা থাকলে চেয়ারে বসে অভ্যাস করবেন।

পরিশেষে ধ্যানাসনে বসে, মেরুদণ্ড সোজা করে ৩-৫ বার ওঁকার ধ্বনি করা। তারপর দু হাতের তালু ঘষে চোখের ওপর প্রলেপ লাগিয়ে বিশ্রাম।

বিঃ দ্রঃ : বিশেষ ভাবে ভুজঙ্গাসন, শলভাষণ, উষ্ট্রাসন, বীরভদ্রাসন, অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন ও গোমুখাসন সারভাইক্যাল স্পন্ডেলাইটিস-এর জন্য বিশেষ সহায়ক আসন।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

৯৩ বছরের জীবন্ত কিংবদন্তী

মান্না দে

বিকাশ ভট্টাচার্য

আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী মান্না দে আর ছ' বছর পর শতায়ু হবেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৯৩ বছর। বাবা পূর্ণচন্দ্র দে ও মা মহামায়া দে-র সন্তান প্রবোধ চন্দ্র দে মধ্য কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে ১ মে ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা স্কটিশচার্চ স্কুল ও কলেজে। মান্না দে-র গান শুনে আবেগে ভাসেননি এমন মানুষ নেই। আজকের ইউটিউবময় দুনিয়ায়, ব্যান্ডের গানের দৌরাত্ম্যেও তাঁর গান কোমল প্রলেপের মতো— আমাদের হৃদয় জুড়ে থাকে।

খুব ছোটবেলায় কান খাড়া করে থাকতাম অনুরোধের আসরে। শেষ গান থাকতো হয় হেমন্ত, নয় মান্না। 'এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি', 'আমি নিরালায় বসে', 'ও আমার মন যমুনা'র, 'তীর ভাঙ্গা ঢেউ আর নীড় ভাঙ্গা ঝড়'— এমন অজস্র গান তখন বাজার মাত করছে। পুজোর সময় উন্মুখ হয়ে থাকতাম তাঁর নতুন ডিস্ক-এর জন্য। তখন বাংলা সিনেমায় প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে একছত্র রাজত্ব করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'শাপমোচন', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'শিল্পী' প্রভৃতি ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে হেমন্তর গান তখন সুপার হিট। তখন বাংলা ছবিতে মান্না দে-র প্লেব্যাক মানে 'একদিন রাত্রে'-র 'এই দুনিয়ায় ভাই সভি হ্যায়' বা বসন্ত-সুচিত্রা অভিনীত 'হসপিটাল' ছবিতে 'এমন বন্ধু আর কে আছে' বা 'ডাক- হরকরা'র 'লাল পাগড়ি বেঁধে মাথে' বা 'শেষ বিচারের আশায় আশায়' ইত্যাদি কিছু গান। রোম্যান্টিক গানে তখনও তিনি তেমন ভাবে আদৃত হননি বা বলা যায় তাঁকে সে ভাবে ব্যবহার করা হয়নি। অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায় বা পবিত্র চট্টোপাধ্যায়— এঁদের পরবর্তী সুরকারেরা অর্থাৎ সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ— এঁরা উত্তম-সুচিত্রা- হেমন্ত জুটির বাইরে একটু চিন্তা-ভাবনা করলেন! ষাটের দশকের প্রায় শুরু থেকেই উত্তমকুমার তাঁর সফল জুটির বাইরে অন্য নায়িকাদের সঙ্গে এক অন্যতর পথে পা বাড়াচ্ছেন। আর তখনই প্রায় হেমন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই উত্তমকণ্ঠের নেপথ্যে চলে এলেন মান্না দে। উত্তম-মাধবী জুটির 'শঙ্খবেলা'য় 'কে প্রথম কাছে এসেছি', উত্তম-তনুজার 'এন্টনী ফিরিঙ্গি'তে 'আমি যামিনী তুমি শশী হে' ইত্যাদি গান, উত্তম-আরতির 'স্ত্রী' ছবিতে 'হাজার টাকার ঝাড় বাতিটা' ইত্যাদি বা উত্তম-সুপ্রিয়ার 'চিরদিনের', উত্তম-সাবিত্রীর 'ধন্যি মেয়ে'র 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল' ইত্যাদি অসংখ্য বাংলা ছবির নেপথ্যকণ্ঠের শিল্পী রূপে মান্না দে তখন রাতারাতি প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। উত্তমকুমারের লিপে তিনি নিয়ে এলেন নানা অলংকার। উত্তমকুমার ছাড়াও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ প্রমুখ বিখ্যাত অভিনেতার লিপে এক একটা গান হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠে এক কথায় অভূতপূর্ব। একবার স্মরণে আনুন, 'জীবনে কি পাব না', 'আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না' বা 'ছদ্মবেশী'র আমি কোন্ পথে যে চলি'। প্রতিটি গান, তাঁর স্বরক্ষেপণ, গায়কি ও পরিবেশনায় এক কথায় অনবদ্য। নজরুলগীতিও বাংলা ছবিতে তাঁর কণ্ঠে যেন নতুন দিশা পেয়েছে। 'দেবদাস' ছবির 'শাওন রাতে' বা 'যে দিন লব বিদায়' তাঁর কণ্ঠে এক অন্যমাত্রা পেয়েছে। এক কথায় বৈচিত্র্যময় বাংলা গানে মান্না দে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু সিনেমা বা বেসিক রেকর্ডের কথা বলি কেন। তাঁর গাওয়া 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' বা 'সে আমার ছোট বোন, আদরের ছোট বোন' অথবা বেশ বেশী বয়সে গাওয়া 'আমায় একটু জায়গা দাও আমি মায়ের মন্দিরে বসি'— এসব গান শুনলে যে কেউ নস্টালজিক হবেনই।

মান্না দে-র গানের তালিম কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং ওস্তাদ দবীর খানের কাছে। প্রথম গান ১৯৪৩ সালে 'তামান্না' ছবিতে। তাঁর বিরাট গানের ভাণ্ডার হিন্দী ছবির জগতে। অসংখ্য গান—যা আজও নবীন গাইয়েরা গাইবার লোভ সামলাতে পারেন না। সে আলোচনায় যাচ্ছি না। সেটা মহাভারত হবে! এমন কোনও আঞ্চলিক ভাষা নেই যাতে তিনি গান গাননি। তাঁর গানের রেকর্ডের সংখ্যা ৩৫০০। দক্ষিণের সুলোচনা কুমারনের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দুই কন্যা সুরমা ও সুমিতা। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরবাসী। স্ত্রী সম্প্রতি গত হয়েছেন। আমরা গায়ক মান্না দে-কেই বেশী জানি। কিন্তু তাঁর মতো সুরকার ক'জন আছেন? শিক্ষক হিসেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর সুরকরা গান 'আমার বলার কিছু ছিল না' হৈমন্তী শুক্লাকে দিয়ে যে ভাবে তুলিয়েছেন— সে কথা বলতে গিয়ে এখনও হৈমন্তী শুক্লা শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়েন। ওঁর বড় মেয়ের বন্ধু ছিলেন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। ছোট্ট কবিতার গলা মান্না দের নজর কাড়ে। কবিতাকে নিজের কাছে রেখে গান শেখান তিনি। গানের জগতের মানুষ হলেও খেলাধূলার খুব ভক্ত। মোহনবাগানের সমর্থক। যখন বোম্বাইতে থাকতেন তখন বন্ধুবর শচীন কর্তার সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখতে যেতেন। খাস ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক ছিলেন শচীন কর্তা। ঝগড়া করতে করতেই দুজনে খেলার মজাটাও নিতেন। একসময় গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তিও শিখতেন তিনি।

সকলের প্রিয় এই শিল্পী এখন অসুস্থ। পরম কল্যাণময় তাঁকে সুস্থ রাখুন। শতায়ু করুন— এই প্রার্থনা।

শব্দরূপ-৬৩০ শ্যামা পাণ্ডা

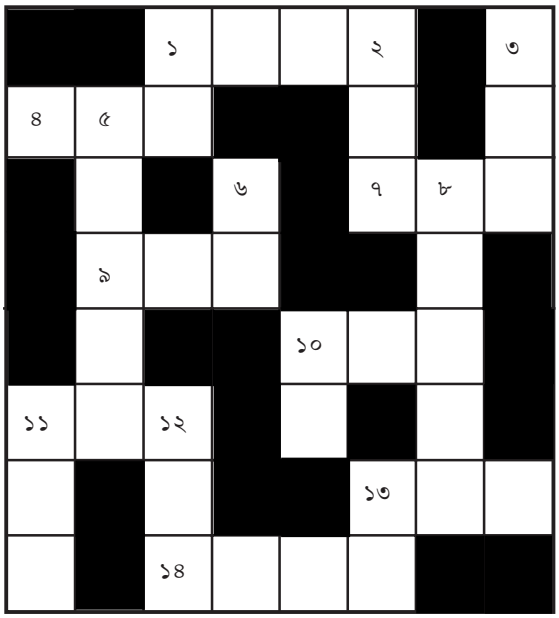

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. প্রথম দু'য়ে ফুল, শেষ দু'য়ে তীর আসলে কামদেবের ধনুক, ৪. প্রতিশব্দে বন, জঙ্গল, ৭. সুমালী রাক্ষসের কন্যা ও মহর্ষি বিশ্বশ্রবার স্ত্রী, রাবণ-এর মাতা, ৯. পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রপত্নী, ১০. সূর্যবংশীয় বিষ্ণুভক্ত রাজা, এঁর পুত্রের নাম অম্বরীষ, শেষ দু'য়ে আভা, ১১. তৎসম কাঁঠাল, ১৩. পত্নীর পরিচয়ে শিব, ১৪. দৈত্যবিশেষ, এক-দুয়ে নীর।

উপর-নীচ : ১. প্রতিশব্দে সুকৃত, বিশেষণে পবিত্র, বিপরীতে পাপ, ২. তৎসম রাত্রি বা নিশা, প্রথম দু'য়ে ধূলা, ৩. তৎসম শব্দে প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণ ও গভীর বুদ্ধি, ৫. সূর্যের পুত্র, ৬. তৎসম পাতা, ৮. কংসের ভগিনী, বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়, ১০. সাপ, ১১. বৃষ্টির দেবতা, ১২. পদ্ম ফুল, ১৩. দুধের আস্তরণ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২৭
সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
বিশ্বরূপ দে,
ইংলিশবাজার, মালদা

বি	জ	য়	ধ	নু			ঊ
	রা			রা			র্মি
	স			নি	কু	ম্ভি	লা
অ	ন্ধ	ক			বে		
		ঙ্গু			র	বা	ব
উ	প	রা	গ			সু	
দ্ধ			ণে			দে	
ব			শ	ক্র	ভ	ব	ন

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৩০ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ জুলাই, ২০১২ সংখ্যায়

নেত্রদান মহাদান

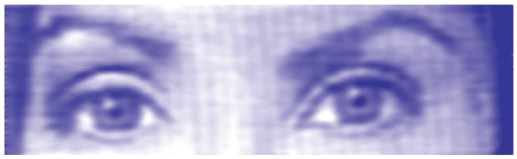

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

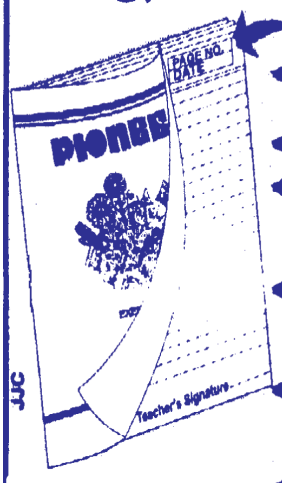

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।

পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।

আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।

ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।

প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।

প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ১

মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারত-এর মতো মহাকাব্য রচনা করেছেন, বেদ-কে চারভাগে বিভক্ত করেছেন— সেজন্য উনি 'বেদব্যাস' নামেও পরিচিত। বিশ্বের প্রথম চক্রবর্তী সম্রাট ভরতের নামে আমাদের দেশের নাম ভারত। মহাভারতের কাহিনী ব্যাসদেব নিজ -শিষ্যদের শুনিয়েছিলেন, পরে গণপতি গণেশ তা লিপিবদ্ধ করেন। মূল মহাভারতে এক লক্ষাধিক শ্লোক রয়েছে। আঠারোটি পর্বে বিভক্ত। এই মহাকাব্য স্বকীয়তায় পবিত্র ও ঐতিহাসিক। যেমন রামায়ণ রঘু বংশের ইতিহাস, তেমনই মহাভারতও ভরত বংশের ইতিহাস। মহাভারতে উল্লিখিত পরিবেশ পরিস্থিতি আজও প্রাসঙ্গিক। পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তদ্রূপ সমস্যার সমাধান সম্ভব ও সহজ হয়। বালক-কিশোর পাঠকদের জন্যই এই চিত্রকথা।

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

পাঞ্জাবে পুর-নির্বাচনেও বিজেপি-অকালি জোটের বিপুল জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাঞ্জাবে আকালি দল-বিজেপি মোর্চা বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখার পর রাজ্যের স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনেও চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করল। পাঞ্জাবের প্রমুখ শহর— পাতিয়ালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা এবং অমৃতসর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে আকালি-বিজেপি জোট একরকম একতরফা জয়লাভ করেছে। এছাড়া তিনটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং ২৬টি নগর পঞ্চায়েতেও জোট ভালোরকম সাফল্য পেয়েছে।

আকালি দলনেতা এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল এই জয়কে আকালি-বিজেপি সরকারের প্রতি জনগণের সার্বিক আস্থাজ্ঞাপন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই জয় অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রে ইউ পি এ-র পরিবর্তে এন ডি এ জোটের সরকার গড়ার দিকেই ইঙ্গিত করছে।

প্রসঙ্গত, শিরোমণি আকালি দল এন ডি এ জোটের অন্যতম শরিক।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল

কর্পোরেশন	মোট আসন	প্রাপ্ত ফল	আকালি দল	বিজেপি	কংগ্রেস	নির্দল	অন্যান্য
অমৃতসর	৬৫	৬৩	২৪	২৪	৪	১০	১ CPI
জলন্ধর	৬০	৬০	১১	১৯	২২	০৬	০২ BSP
লুধিয়ানা	৭৫	৭০	২৯	১৩	১১	১৭	০
পাতিয়ালা	৫০	৪৯ একটি আসনে পুনর্নির্বাচন হবে	৩২	০৭	০৮	০২	

মুদ্রা পাচার

সম্প্রতি গাইঘাটা সীমান্ত থেকে বি এস এফ ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করে। এই বিপুল পরিমাণ মুদ্রা অবৈধ পাচারের দায়ে গ্রেপ্তার করে ৫ বাংলাদেশীকে। তথ্য ও ছবি : রমেশ মণ্ডল

ত্রিপুরা হয়ে অসমে ৯ আই এস আই এজেন্ট

গত ২৩ মে রাতে খোয়াই সীমান্ত দিয়ে ৯ পাকিস্তানী আই এস আই-এর এজেন্ট অসমে প্রবেশ করেছে। ত্রিপুরা থেকে রেলযোগে তারা অসমে গিয়েছে। প্রায়ই খোয়াই-বাংলাদেশ সীমান্তকে ব্যবহার করে এধরনের ঘটনা ঘটছে। গোয়েন্দাদের নজরে বিষয়টি এসেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ।

হিন্দু নির্যাতন

গত ১৪ মে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুসলিম দুষ্কৃতীরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর এলাকার তারানগর গ্রামে ৪৩টি হিন্দু বাড়ি লুঠ করে। পুলিশের সামনেই দুই হিন্দু গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে সৌকত খানের বাড়ি থেকে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। সি পি এমের সঙ্গে পুরনো গণ্ডগোলের জেরে ওইদিনই সকালে এস ইউ সি আই নেতা সৌকত খানের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা বলে অভিযোগ। গত ১ জুন আর এস এস এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ঝড়-জল থেকে রেহাই দেবার জন্য তেরপল বিতরণ করা হয়।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
18 June - 2012

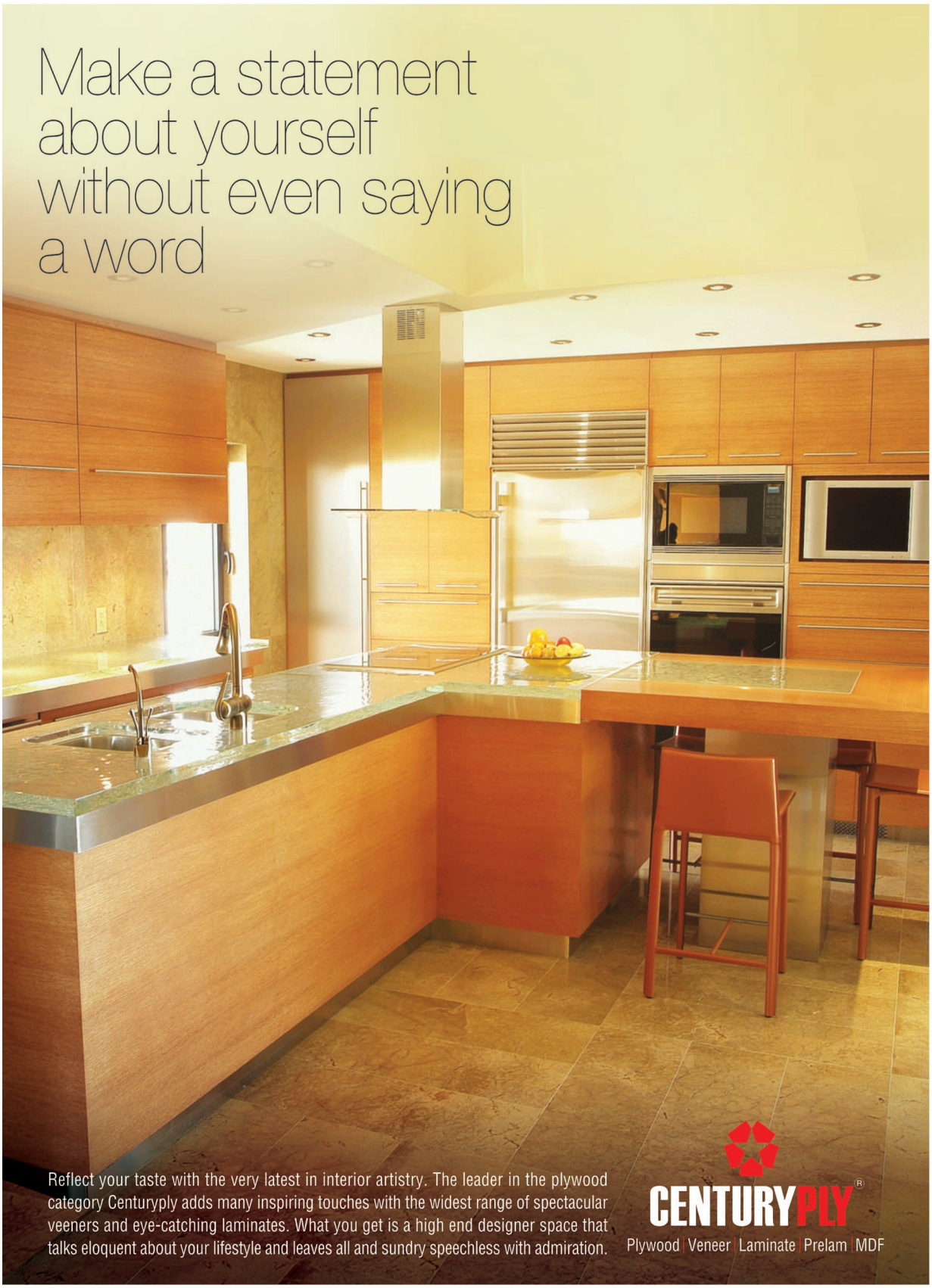

দাম : ৭.০০ টাকা